দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ২৩ জানুয়ারি - ২০১২, ৮ মাঘ - ১৪১৮

বইমেলা
বই উৎসব

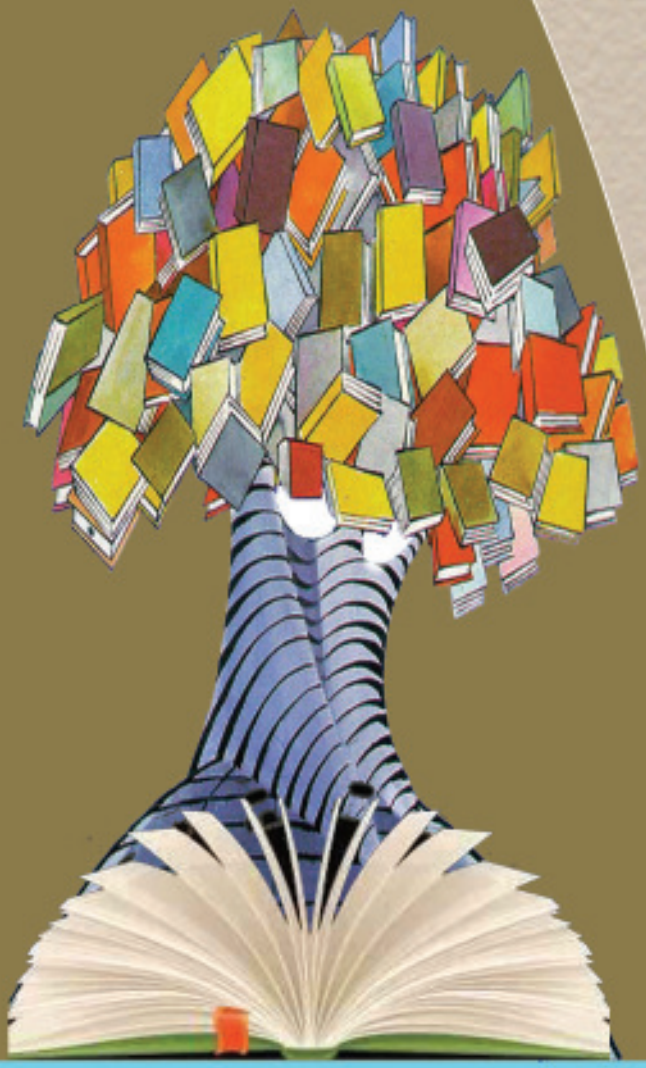

প্রসঙ্গ : বইমেলা
..... পৃঃ ১৫—১৯

মৃত্যুর আগেই
মৃত্যুদণ্ড নেতাজীকে..... পৃঃ ১১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে 'অনিলায়নে'র বদলে কি এখন 'সবুজায়ন' আনা হচ্ছে? ❑ ৮

বুদ্ধবাবুর স্বৈরতন্ত্রের পথেই মমতাদেবী? ❑ ৯

জাগতিক মৃত্যুর আগেই মৃত্যুদণ্ড নেতাজীকে ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑ ১১

চীনের বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারের অধীন ❑ অরিন্দম চৌধুরী ❑ ১৩

বই নিয়ে আমাদের মাতমাতি কি শুধু বারোদিনের? ❑ রমাপ্রসাদ দত্ত ❑ ১৫

বইমেলার মাঠের অভিজ্ঞতা ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ১৭

বইমেলার সঙ্গী হয়ে ❑ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ১৮

কলকাতায় আঞ্চলিক বইমেলা ❑ অর্ণব নাগ ❑ ১৯

খোলা চিঠি : শীতের সার্কাস জমজমাট, তৃণমূল সাপ না ব্যাঙ? ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জমজমাট একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২৩

বিদ্যার দেবী সরস্বতী ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ২৪

লাঠিবাজি ছেড়ে গলাবাজিতে মজেই বাঙালী মরেছে ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ২৮

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ২০** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑

অঙ্গনা : ২৫ ❑ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ২৬-২৭** ❑ **সমাবেশ সমাচার : ৩০-৩১**

❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

'বই উৎসব ও আমরা'
পৃঃ ১৫—১৯

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৮ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ২৩ জানুয়ারি - ২০১২

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের সহৃদয় পাঠকদের জানাচ্ছি, গত কয়েক মাসে নিউজপ্রিন্টের দাম এবং কাগজ ছাপার আনুষঙ্গিক খরচ যেভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান মূল্যে স্বস্তিকা আপনাদের হাতে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়েই এই সংখ্যা থেকে (২৩ জানুয়ারি, ৬৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২৫ টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার এই আর্থিক সংকটময় মুহূর্তে পাঠকবর্গের একান্ত সহযোগিতা আমাদের একমাত্র কাম্য। বিগত ৬৪ বছর ধরে আপনাদের সহৃদয় চিত্তের যে প্রেরণা স্বস্তিকা-কে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না— এই প্রত্যাশা রইল।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

৩০ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে

স্বস্তিকা

প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যা

৩০ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে

বিষয় : ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক ভারতীয় সংস্কৃতি

হিন্দুস্থানের হাজার হাজার বছরের অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত আধ্যাত্মিক চেতনা, সাংস্কৃতিক চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা-র ওপর আধারিত হিন্দু তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিই আজকের ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

লিখেছেন : শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, রবিরঞ্জন সেন, কাঞ্চন গুপ্ত।

দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে লিখেছেন **দেবীপ্রসাদ রায়।**

এছাড়াও অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে থাকছে বিশেষ রচনা।

লিখেছেন — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

সম্পাদকীয়

বইয়ের ভবিষ্যৎ

সাম্প্রতিকতম সময়ে বই সম্পর্কে নানাবিধ বিজ্ঞাননির্ভর জল্পনা কল্পনা শোনা যাইতেছে। বই আদৌ ছাপা হইবে কিনা অথবা বই নামক বস্তুটির অস্তিত্ব রাখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা তাহাই আজ বড় প্রশ্ন। আজকের পৃথিবীতে কম্পিউটারই হইতেছে দেবতা। ইন্টারনেটে ইতিমধ্যেই নানান বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছাপা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা যদি এখন অচল হইয়া থাকে, পঠন-পাঠনের অন্য পদ্ধতি যদি চালু হয়, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আধুনিক প্রযুক্তিতে লেখকের লেখা সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে মানুষের নিকট যাইতে পারে যাহা পূর্বে কল্পনার অতীত ছিল। লেখক লিখিতেন, সেটা পৌঁছাইত প্রকাশকের নিকট, তাহার পর ছাপাখানা বাঁধাইখানা— সব যোগ করিয়া অনেক সময়। তাই 'গ্রন্থ' নামে যে বস্তুটি আমরা এখন দেখিতেছি বর্তমানে তাহার তুলনায় ইন্টারনেট অনেক বেশী উপযোগী। ভবিষ্যতে শুদ্ধবানান জানিবারও মনে হয় আর সকলের প্রয়োজন থাকিবে না। কিছু লিখিবার প্রয়োজন হইলে কম্পিউটারই সব শুদ্ধ করিয়া দিবে। এতদিন ধরিয়া যে পদ্ধতিতে ছাপা হইয়া আসিতেছে তাহার তুলনায় কম্পিউটারের পর্দার ছবি অনেক দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন। কিছুকাল পরে হয়তো দেখা যাইবে লেখকের লেখা লইয়া 'ইন্টারনেট সিরিয়াল' শুরু হইয়াছে! তবুও নানা বইমেলায় হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হইয়া থাকে একমাত্র বইয়ের টানে। কারণ ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখনও দশ হাজারে মাত্র একজন। তাই ছাপা বাঁধাই করা বইয়ের প্রচলন এখনও অব্যাহত। কিন্তু যতদিন যাইতেছে বই পড়ার অভ্যাস কমিতেছে। আমরা এখন কোনও উপন্যাস পড়িবার চাইতে দূরদর্শনে সেই উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখিতেই বেশি ভালবাসি।

কিছু ব্যক্তিকে দেখা যায় যাহারা বই পড়ে, আবার কিছু ব্যক্তিকে দেখা যায় যাহারা বইকে এড়াইয়া চলে। ইহার কারণ কি? এই সম্বন্ধে ২০০৮ সালে ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটি সিম্পোজিয়াম সংগঠিত হইয়াছিল। তাহাতে পাঠের বিবিধ পর্যায় ও কারণ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনায় একটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, কোনও ব্যক্তির পাঠের প্রবণতাকে বুঝিবার জন্য কোনও একটি কারণকে একমাত্র কারণ বলিয়া চিহ্নিত করা উচিত নহে। অন্ত এবং বহিঃ উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই পাঠকের মনোভাবটি তৈরি হয়। কোনও মানুষই বিচ্ছিন্ন কোনও দ্বীপ নহে। অর্থনৈতিক সামাজিক এবং প্রথাগত ভালো বা মন্দ যে চাপগুলি অহর্নিশ ব্যক্তির উপরে ক্রিয়ারত, ব্যক্তির পাঠ ক্রিয়ার উপরও তাহার প্রভাব পড়ে। অবশ্য বই পড়ার অব্যাহত ধারার ক্ষেত্রে শিক্ষার একটি প্রভাব রহিয়াছে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে উৎসাহ ও আগ্রহের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের ক্ষেত্রে প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রকাশক যখন একখানি বই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন তিনি কেবল গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল কর্মের উৎস হিসাবে প্রকাশিত হন তাহাই নয়, এই উদ্যোগে তাঁহার নিজের বিপদগত ঝুঁকিও রহিয়াছে। সবশেষে রহিয়াছে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। একথা ভুলিলে চলিবে না পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে সংবাদপত্রেরও রহিয়াছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জর্জ লুইস বরজেস বলিয়াছেন, 'পত্র-পত্রিকার সম্পাদক নিজে যথেষ্ট পরিমাণে পড়াশোনা করিবেন এবং পাঠকদের পাঠাভ্যাসে উৎসাহদান করিবেন।'

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না। দেখিতেছ না, সুদূর গ্রামে জাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্য-সত্যই পূজিত হইতেছেন, যে-সকল দেশের লোকেরা বহু শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমার শক্তি, না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে; যে-শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ সেই শক্তি। কারণ তুমি আমি, সাধু মহাপুরুষ, এমন কি অবতারগণ সকলেই— সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশমাত্র; সেই শক্তি কোথাও বা কম, কোথাও বা বেশী ঘনীভূত, পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই তোমরা ইহার আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি ভারতকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সত্তর লক্ষ মানুষের সমবেত সূর্য নমস্কার মধ্যপ্রদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দিনের প্রথম সূর্যকে প্রণাম করার অভ্যেস অনেকেরই। সুন্দর মন্ত্র রয়েছে সেজন্যে। মন্ত্র উচ্চারণ না করেও সূর্য প্রণামে কোনও বাধা নেই। মধ্যপ্রদেশে সরকারি উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি সূর্য নমস্কার করল ৭০ লক্ষ মানুষ। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর দাবি করছে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের সূর্য নমস্কারের মধ্যে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল দেখার মতো। রাজ্যের ৬ হাজারের বেশি স্কুলের ছাত্ররা এতে অংশ নেয়। এই প্রণাম-উৎসব আয়োজনের ভাবনাচিন্তা ছিল কিছুদিন আগের। দাবি করা হচ্ছে একসঙ্গে এতজন আগে কোথাও কখনও সূর্যপ্রণামের জন্যে সমবেত হননি।

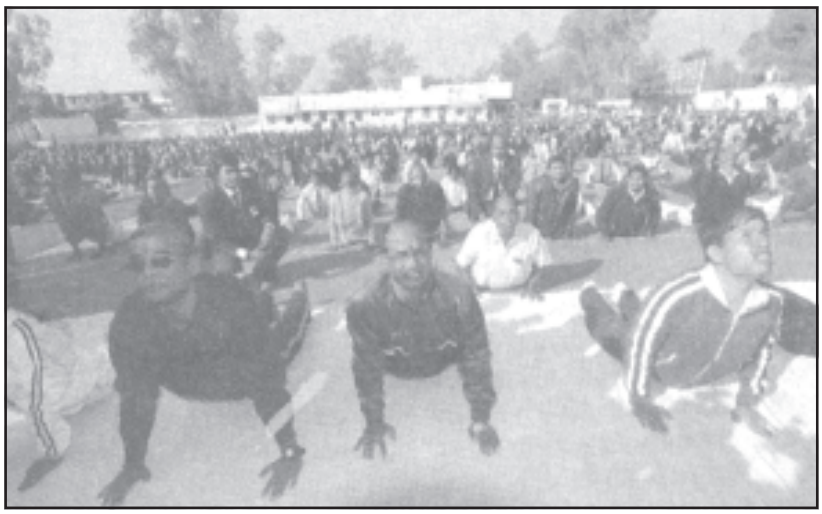

একই সময়ে মধ্যপ্রদেশের মুসলমান গোষ্ঠী ফতোয়া জারি করেছিল সূর্যপ্রণামে অংশ গ্রহণের জন্যে। কারণ ওটা হিন্দুদের আচার। কিন্তু দেখা যায় ওইরকম ফতোয়াকে অস্বীকার করে বহু মুসলমান ছাত্র অংশ নেয় প্রণামে। সূর্যপ্রণামের নজির স্থাপনের উদ্যোগে তারা দূরে থাকতে চায়নি।

রাজ্যের অভিজাত শিক্ষালয় কেম্ব্রিজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রাজেশ্বরী রায় বলেছে, 'সকালে দারুণ ঠাণ্ডা সত্ত্বেও আমরা স্কুলের মাঠে জড়ো হয়েছিলাম সূর্য প্রণামের জন্যে। আরও আনন্দের ব্যাপার, আমাদের শিক্ষকরাও যোগ দিয়েছিলেন প্রণামে।'

তবে রাজেশ্বরী জানত না, এই সূর্যপ্রণামের উদ্দেশ্য যা নজির সৃষ্টির জন্য আয়োজিত হয়েছিল।

সরকারি স্কুল বাব-ই-আলির দশম শ্রেণীর ছাত্রী আলিমা খান জানায়, 'সকালে খুব ঠাণ্ডা ছিল সূর্য নমস্কারের দিন। তবু আমরা জড়ো হয়েছিলাম। এটা যেন সমবেত ব্যায়ামের মতো। আমরা উপভোগ করেছি। দল বেঁধে বিশ্বরেকর্ড করেছি সেটা ভেবেও আনন্দ হচ্ছিল।'

জওহরলাল নেহরু স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আবদুল সামী অংশ নিয়েছিল কিন্তু কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করেনি। সূর্য প্রণামের বাকি ব্যায়াম সে আনন্দে করেছিল অন্যদের সঙ্গে।

যে কয়েকটি মুসলমান সংগঠন সূর্য প্রণামের বিরোধিতা করেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সাজিদ সিদ্দিকী। তাঁদের যুক্তি এভাবে সূর্য প্রণামের আয়োজন সংবিধান-বিরোধী। কারণ মুসলমানদের ধর্মে সূর্য প্রণাম নেই। পাঁচটি সংগঠন সূর্যপ্রণামের বিরোধিতা করে আবেদন জানায় অভিভাবকদের কাছে— সূর্য নমস্কারের দিন তাঁরা যেন ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠান।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে এই সূর্য নমস্কারের আয়োজন হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে গত চার বছর ধরে। তবে এবারই প্রথম সরকার দাবি করছে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন হয়েছে সমবেত প্রণামের মাধ্যমে।

স্কুল শিক্ষা অধিকার এর মধ্যে জানিয়েছে গিনেস বুক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ এই প্রণাম সম্বন্ধে। প্রণামের প্রমাণ হিসেবে ভিডিও চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে সব জায়গায়, যেখানে সূর্য প্রণামের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। সেসব যথাস্থানে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে সূর্যপ্রণামের নয়, সমবেত প্রভাতী ব্যায়ামের নজির স্থাপন করেছিল কাজাখাস্তান। তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল গিনেস বইয়ে। সেখানে ৪৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৮ জন সমবেত হয়েছিল। ২০০৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর তা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্যে এই প্রভাতী ব্যায়ামের আয়োজন করে কাজাখাস্তানের রাষ্ট্রপতির প্রশাসন।

মধ্যপ্রদেশে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও অংশ নিয়েছেন সূর্য প্রণাম অনুষ্ঠানে। আকাশবাণীর ভূপালকেন্দ্র সূর্য প্রণামের সময় নির্দেশ ঘোষণা করে। তা শুনে শুরু হয় প্রণাম সর্বত্র একযোগে। মুখ্যমন্ত্রী সূর্য প্রণামে অংশ নেন স্থানীয় নবীন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর বাঁ হাতে ক'দিন আগে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। দেখা যাচ্ছিল সেলাই করা ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে তাঁকে ব্যায়াম করতে।

সরকারি মুখপাত্র বলেন, সূর্যপ্রণামে নজির সৃষ্টির জন্যে একমাস ধরে প্রস্তুতি চলেছিল।

একই সময়ে বিরোধিতার বিষয়টিও পৌঁছে গেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে। অনুরোধ করা হয়েছে মুসলমান সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে বইয়ের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্যে। কারণ বহুধর্মের সমাজে নাকি সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেবে!

যদিও সূর্যপ্রণামের রেকর্ড গিনেস বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধীর প্রতীক্ষায় মধ্যপ্রদেশের মানুষ।

আই এফ পি আর আই-এর রিপোর্ট

উন্নয়নের কাহিনীর আড়ালে দারিদ্র্যের করুণ কাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতবর্ষের ব্যাপক দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ব্যধি, শিক্ষার অভাব ও সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত কদর্য সামাজিক আচারগুলির কথা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতির দোহাই দিয়ে প্রায়ই এড়িয়ে চলার চেষ্টা হয়। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের লজ্জায় অধোবদন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। উল্লেখিত বৈষম্যগুলিকে বিকশিত হতে দিলে তা যে অচিরেই সামাজিক ক্ষোভকে পুঞ্জীভূত করে আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের কাহিনীকে (গ্রোথ স্টোরি) ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলার রাস্তায় যাবে এমনটাই আন্দাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দেশের জনসংখ্যার শতকরা ২১ ভাগ আধপেটা খায়। ৫ বছরের নীচে বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা ৪৪ ভাগ সঠিক ওজনমাত্রার নীচে। এদের মধ্যে আবার শতকরা ৭ শতাংশ ৫ বছরের জন্মদিন দেখার আগেই মারা যায়। এই করুণ পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে দেশ আজ পৃথিবীর দারিদ্রকবলিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনায়াসে এক পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলো মাত্র কঙ্গো, চাদ, ইথিওপিয়া আর বুরুন্ডির মতো দারিদ্রকবলিত অতি ক্ষুদ্র দেশগুলির তুলনায় আগে থাকলেও সুদান, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান এমনকী ক্ষুদ্র নেপালকেও এবিষয়ে আমরা পেছনে ফেলতে পারিনি। ইন্টারন্যাশানাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আই এফ পি আর আই)-এর সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদন থেকেই ওপরের পরিসংখ্যানগুলি পাওয়া গেছে। এই সংস্থার বিশ্বের ৮০টি দেশের ওপর উপরিউক্ত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে তৈরি করা তথ্যানুযায়ী ভারত অপুষ্টির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে আজ ৬৭তম স্থানে অর্থাৎ যা আশির মধ্যে সাতষট্টিতে থাকায় চরম অপুষ্টিই নির্দেশ করে।

গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জি এইচ আই)-এর সংগৃহীত পরিসংখ্যান মোতাবেক ১৯৯০-এর পর থেকে শিশুদের অপুষ্টি ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যায় কিছুটা রাশ পড়লেও সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কিন্তু আদতে বেড়ে গেছে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ভারতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত বা আধপেটা খেয়ে আছে; এটি পূর্বোল্লিখিত জি এইচ আই-এর পরিসংখ্যান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদিত ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (এফ এ ও) অনুযায়ী সংখ্যাটা আরও ভয়াবহ ২৩ কোটি। এই তফাতটি এফ এ ও-র কেবলমাত্র মানুষের ক্যালরি গ্রহণ করার পরিসংখ্যান ভিত্তিক এবং জি এইচ আই-এর হিসেবটি আরও অন্য কিছু বিষয়কেও মাথায় রেখে তৈরি।

পৃথিবীর ৪২ কোটি ক্ষুধার্ত লোকের মধ্যে শুধু ভারতেই বাস করে তার এক চতুর্থাংশ। ন্যাশানাল ফ্যামিলি ও হেল্থ সার্ভিসের (এন এফ এইচ এস) ২০০৪-০৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের একটা বৃহৎ অংশ যে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই যে অনাহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার একটা মর্মান্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে ২৩ শতাংশ, বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে ৫২ শতাংশ ও শিশুদের ৭২ শতাংশ মর্মন্তুদভাবে রক্তাল্পতায় ভুগছে। সারা বিশ্ব জুড়ে সংঘটিত হওয়া সমীক্ষা অনুযায়ী একজন অর্ধভুক্ত গর্ভবতী নারীর কাছ থেকে তার গর্ভস্থ ভ্রূণ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি স্বাভাবিকভাবেই পায় না। পরিণতিতে মাতৃগর্ভেই শিশুটির করুণ ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকি তার জন্মলব্ধ ভবিতব্য হয়। তাই ক্ষুধার্ত থাকা ও অর্ধাহারের এই মারাত্মক প্রবণতা রুখতে না পারলে তা শুধু সংশ্লিষ্ট মানুষজনেরই দুরবস্থাই বাড়াবে না, পরিণামে ভবিষ্যতে সুস্থ প্রজন্মের ভারতীয় মাত্রকেই জন্ম থেকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেবে।

স্ট্যালিনের রাশিয়ায় গোপনে খৃস্টানীকরণ পুতিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টির বিরুদ্ধে সেদেশের জনগণ বিপুল বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে। তাঁরা পুতিনের নির্বাচনকেও ইতিমধ্যে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করার দাবীও পেশ করেছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয়বারের জন্য রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদাকাঙ্ক্ষী পুতিন একটি বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছেন।

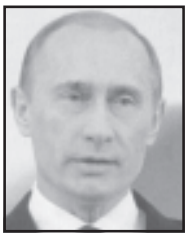

সংবাদে প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী পুতিন গত ৬ ও ৭ জানুয়ারি তাঁর জন্ম শহর সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি অর্থোডক্স চার্চের নৈশকালীন একান্তভাবে খৃস্টীয় অনুশাসন অনুসারী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ওই অনুষ্ঠানেই তিনি আরও জানান যে এই বিশেষ চার্চটিতেই জন্মের পরে অত্যন্ত গোপনে তাঁর খৃস্টীয়করণ (Christened) হয়। এই খৃস্ট ধর্মের আচারটি একান্ত গোপনে পালন করেছিলেন তাঁর মা ও এক প্রতিবেশী। উল্লেখ্য, পুতিনের জন্ম ১৯৫২ সালে অর্থাৎ মহাশক্তিধর সোভিয়েত একনায়ক জোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যুর এক বছর আগে। পুতিনের এই স্বীকারোক্তি তাঁর সরকারি ওয়েবসাইটেও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তাঁর বাবা তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যই শুধু ছিলেন না, আচার-ব্যবহার বিশ্বাসেও ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া ও নাস্তিক। যা ছিল তৎকালীন রাশিয়ার একান্তই সরকারি লাইন মোতাবেক।

পুতিন জানান, তাঁর বাবাকে এড়িয়ে ও তাঁর বিরূপতার আশঙ্কাতেই অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তাঁর ধর্মবিশ্বাসী মা একান্ত শিশু অবস্থাতেই এই খৃস্টীয় আচার সম্পাদন করেন।

উল্লেখ্য, রাজনীতিতে যোগদানের আগে পুতিন ছিলেন দুর্ধর্ষ সোভিয়েত কে. জি. বি. সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য। কে জি বি তাদের কাজের অঙ্গ হিসেবে যে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আচার আচরণকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দমন করত। সংবাদে প্রকাশ, পুতিন তাঁর খ্রীস্টমাস বাণীতে চার্চগুলিকে সরকারি ও জনস্বার্থবাহী সংস্থাগুলির সঙ্গে আরও সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। ৭২ বছরের লৌহ যবনিকার আতঙ্ক ও মগজ ধোলাই যে মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও জীবনযাত্রার অঙ্গ ধর্মচিন্তাকে শুধু ধামাচাপা দিয়েই রেখেছিল, অন্তরে আঁচড় কাটতে পারেনি তা আবার নজরে এলো।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ‘অনিলায়নে’র বদলে কি এখন ‘সবুজায়ন’ আনা হচ্ছে?

গূঢ়পুরুষের

কলম

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিনায়িকা ‘দিদি’ সবাইকে চুপ করে থাকতে বলেছেন। সবাই মানে সেইসব অর্বাচীন সমালোচকদের যারা ‘দিদি’-র ভাল ভাল কাজ দেখতে পায় না। যেমন, জেলায় জেলায় স্কুলে কলেজে শিক্ষকদের বেদম পিটুনি দিলে শিক্ষাক্ষেত্রে গেল গেল রব তোলে কিছু লোক। একবারও তারা ভেবে দেখে না যে ‘দিদি’-র ছোট ছোট অনুগত ভাইয়েরা বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে, শিক্ষার উন্নয়নে লাঠি হাতে গত ৩৪ বছরের পচা আবর্জনা সাফাইয়ের কাজে নেমেছে। বোঝে না যে ভাল রকম ধোলাই না হলে ময়লা কাপড় সাফ হয় না। কাপড়ের ময়লা সাফ করতে প্রয়োজনে সাধারণ ধোলাইয়ের বদলে ‘আড়ং ধোলাই’ দিতে হয়। তবেই যথার্থ পরিবর্তন আসে। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এখন পরিবর্তনের আড়ং ধোলাই চলছে। সমালোচকরা দয়া করে চুপ করে থাকুন। অপেক্ষা করুন, শিক্ষাক্ষেত্র কেমন উজ্জ্বল ঝলমলে হয়ে ওঠে দেখার জন্য। শিক্ষার সংস্কার এখন শিক্ষকরা করেন না। সেই অধিকার গত ৩৪ বছরে বাম সরকার (পড়ুন অনিল বিশ্বাস) শিক্ষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদককে দিয়েছিল। রাজ্যের ৯০ শতাংশ স্কুল কলেজের অধ্যক্ষের পদটি বরাদ্দ ছিল পার্টির সেবক কমরেডদের জন্য। এই খবরটি রাজ্যবাসীর অজানা ছিল! অথবা জানা থাকলেও মেনে নিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা। ‘দিদি’ মানেননি। তাই এখন স্কুল কলেজে ধোলাই চলছে। ধোলাই শেষে দেখবেন শিক্ষাক্ষেত্রে আর কোথাও ‘লাল’ নেই। সব কেমন নির্মল ‘সবুজ’ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ‘অনিলায়নের’ পরিবর্তন ঘটিয়ে ‘দিদি’ আনবেন ‘সবুজায়ন’। সেই দিনটি দেখতে চাইলে দয়া করে এখন চুপ থাকুন।

রাজ্যবাসীর শুভাশুভের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম ১০০ দিনেই দিদি উন্নয়নের ৭৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। মহাকরণের তথ্য ও সংস্কৃতির দফতর সাফল্যের খতিয়ান প্রকাশও করেছে। অথচ সেইসব করে ফেলা উন্নয়নের তথ্য রাজ্যবাসীর অজানাই থেকে গেছে। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমকে বিনামূল্যে সাফল্যের খতিয়ান বইটি দেওয়া হয়। অথচ খবরের কাগজ, টিভিতে খতিয়ান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। ফলে, রাজ্যবাসী জানতেই পারেনি তাঁদের কত উন্নতি

যে আনন্দ চ্যানেলে একদা দিদির সবুজায়নের স্বপ্ন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউয়ের নামে ফলাও করে প্রচার করেছে, সেই চ্যানেল এখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে বলে নিত্য প্রচার চালাচ্ছে। এটা কি নিমকহারামি নয়? দিদির সফর সঙ্গী হয়ে হেলিকপ্টারে ঘুরবো, দিদির স্নেহে, প্রশ্রয়ে সংবাদ জগতে মাস্তানি করবো এবং পরে পাল্টি খেয়ে উল্টোপাল্টা প্রচার করবো এইসব ধান্দাবাজি আর চলবে না। দিদি এইসব ‘গদ্দারি’ একেবারেই পছন্দ করেন না।

হয়েছে। পরিবর্তনের ধামাকায় তাঁরা কেমন এখন দুধে ভাতে আছেন। এরপরে যদি ‘দিদি’ বলেন সংবাদমাধ্যম বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থরক্ষা করছে তবে কী তিনি ভুল বলছেন। দিদি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে দিচ্ছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। ডাক্তারবাবুদের এখন প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টা হাসপাতালে ডিউটি করতে হচ্ছে। অথচ সংবাদমাধ্যম হাসপাতালে শিশু মৃত্যু, শিশু চুরি অথবা অবহেলায় প্রসূতির মৃত্যুর মতো ছোট ছোট ঘটনাকে ফলাও করে প্রচার করছে। এই তিলকে তাল বানিয়ে সংবাদমাধ্যম কী বার্তা দিতে চাইছে জানতে চান দিদি। তাঁর গোঁসা হওয়ারই কথা। যে আনন্দ চ্যানেল একদা দিদির সবুজায়নের স্বপ্ন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউয়ের নামে ফলাও করে প্রচার করেছে, সেই চ্যানেল এখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে বলে নিত্য প্রচার চালাচ্ছে। এটা কি নিমকহারামি নয়? দিদির সফর সঙ্গী হয়ে হেলিকপ্টারে ঘুরবো, দিদির স্নেহে, প্রশ্রয়ে সংবাদ জগতে মাস্তানি করবো এবং পরে পাল্টি খেয়ে উল্টোপাল্টা প্রচার করবো এইসব ধান্দাবাজি আর চলবে না। দিদি এইসব ‘গদ্দারি’ একেবারেই পছন্দ করেন না।

একটা গোপন খবর জানাই। দিদি সাংবাদিকদের শিক্ষিত করতে ‘ধোলাই’ ওষুধটি ব্যবহারের কথা ভাবছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আবর্জনা হঠাতে ‘ধোলাই’ ডিটারজেন্ট ব্যবহার সফল হলেই সরকারি স্বাস্থ্য এবং বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে তা ব্যবহার করা হবে। মহাকরণে ‘পরিকল্পনা’ বিভাগের বিশেষজ্ঞ আমলারা জানিয়েছেন যে ‘ধোলাই’ ওষুধের প্রচার ও ব্যবহারের কাজে কমপক্ষে দশ হাজার বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে। মহাকরণে গুজব, আগামী রাজ্য বাজেটে ‘ধোলাই’ কর্মীদের বেতন ও ভাতা বাবদ বিশেষ অর্থ বরাদ্দের সম্ভাবনা আছে। রাজ্যের অর্থ সচিব আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা একেবারে পাকা। সমস্যা একটাই। ধোলাই কর্মীদের পদের নাম কী হবে তা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভায় মত বিরোধ দেখা দিয়েছে। দিদি বলে দিয়েছেন ধোলাই কর্মীদের ‘লেঠেল’ বা ‘রজক’ বলা যাবে না। দলিত সমাজ অনুমোদন করবে না। ধোলাই কর্মীদের সাফাই কর্মীও বলা যাবে না। রাজ্যের পুরসভার সাফাই কর্মীদের বিস্তর আপত্তি আছে। নামকরণের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে দিদি এবার মন্ত্রিসভাই ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়ছেন।

এখন দেখার, ধোলাই দাওয়াইয়ের দায়িত্ব স্বাস্থ্য অথবা শিক্ষা অথবা তথ্য-সংস্কৃতি— কোন দফতরের মন্ত্রী পাবেন।

বুদ্ধবাবুর স্বৈরতন্ত্রের পথেই মমতাদেবী?

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একের পর এক শিক্ষক-অধ্যাপক-অধ্যক্ষদের উপর আক্রমণ। রায়গঞ্জ-মাজদিয়া-রামপুরহাট। রায়গঞ্জে অধ্যক্ষ আক্রান্ত হলেন। সাধারণ মানুষের দাবি-প্রতিবাদের ফলে কয়েকজনকে জামিনযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হলো। ফলে আক্রমণকারীরা জামিন পেয়ে গেলেন। এখানে আক্রমণকারীরা ছাত্র নন— স্থানীয় তৃণমূল নেতা। মাজদিয়াতে অধ্যক্ষ প্রহৃত হলেন। আক্রমণকারীরা এস এফ আই কর্মী। এঁদের জামিনের অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁরা এখন জেল হাজতে। রামপুরহাট-এর অধ্যক্ষকেও আক্রমণ করা হলো। তিনি সংজ্ঞাহীন হলেন। রায়গঞ্জের আক্রান্ত অধ্যক্ষের অপরাধ হলো— তিনি সিপিএমের লোক। এ নিয়ে পরিবর্তন-পন্থী শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন— ''একজন ব্যক্তির সিপিএম হওয়ার ১০০ ভাগ অধিকার আছে। রায়গঞ্জে যা হচ্ছে তা ভারতীয় সংবিধান বিরোধী।'

মাজদিয়ার ঘটনা আইনের পথেই চলেছে। তবে এই ঘটনা নিন্দনীয়। এস এফ আই-এর কিছু কর্মী যদি মনে করেন থাকেন যে বামফ্রন্ট সরকার এখনও আছে এবং সেই সরকারকে ঢাল করে কলেজে কেবলমাত্র এস এফ আই-এর একচ্ছত্র রাজত্ব চলবে তবে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তাঁদের চৈতন্য উদয় হওয়ার দরকার।

রামপুরহাটের অধ্যক্ষের ঘটনার পর প্রশাসনের কর্তার বক্তব্য— 'অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তিনি ঠিকমতো কাজ করছেন না। অধ্যক্ষের যোগ্য সম্মান পাওয়ার জন্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করা উচিত।' এখানেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে— এই অধ্যক্ষও সিপিএম-এর লোক! এ ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'এটা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দেখার বিষয়।' ব্রাত্যবাবু গড়গড় করে ইংরাজিতে বলে গেলেন, ''আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত উভয়েই মিডিয়ার দৌলতে নায়কের ভূমিকাতে সামনে এসেছে।''

উল্লেখ করা প্রয়োজন, রায়গঞ্জের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''ছোট ঘটনা। ছোটরা এটা করে ফেলেছে। ছোটরা ভুল করলে সেটা ক্ষমা করে দিতে হয়— নেতাজী এই কথা বলেছিলেন।'' রায়গঞ্জের ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুরও মন্তব্য ছিল— ''এটা ছোট ঘটনা।'' রামপুরহাটের ঘটনার পর শিক্ষাব্রতী সুনন্দবাবুর বক্তব্য, 'এটা অত্যন্ত অন্যায়। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এসব ঘটনাকে উস্কে দিচ্ছে। সিপিএম-তৃণমূলের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে। প্রয়োজনে পথে নামব।'

এখন যে প্রশ্নটা তোলার দরকার তা' হলো স্কুলে নির্বাচনে হাঙ্গামা, কলেজে কলেজে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে যে অধ্যক্ষদের ভূমিকা ছাত্র সংগঠনের পছন্দ হবে না, সেই অধ্যক্ষকে হেনস্থা করার উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। কারণ কলেজ ইউনিয়ন দখলের অভিযানে কোনও বাধা না-রাখা। কলেজ ইউনিয়নের হাতে ভর্তির একছত্র ক্ষমতা রাখা। শোনা যায় এই ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে টাকা-পয়সার লেনদেন করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি সিপিএম শিয়ালদহ অঞ্চলের একজন লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং ছাত্র-নেতাকে ছাত্র-ভর্তিতে এই রকম কাজের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

ইউনিয়ন নিয়ে দখলদারির লড়াইয়ের আর একটি কারণ হলো— ইউনিয়ন- এর অধীনে চিপ স্টোর, চিপ ক্যান্টিন, সর্বোপরি ইউনিয়নের সোস্যাল-এ হাজার হাজার টাকার লেনদেন। শিল্পী ঠিক করাতেও নাকি 'কমিশন'-এর ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়নের দখলদারির পেছনে 'বহিরাগত দাদাদের' প্রবেশের আর একটি কারণ দলের 'কর্মী' রিক্রুট করা। এককথায় লিডারদের ল্যাডার তৈরি করা। আর এইসব দাদাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই ছাত্র-সংঘর্ষ, শিক্ষক-অধ্যাপক-অধ্যক্ষ পেটাই। এজন্যই কি রায়গঞ্জের তিলকবাবু সামনে এলেন? তাঁকে নিয়ে মন্ত্রী মদন মিত্রের সভা হলো। রামপুরহাটের ঘটনার পরেই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (ববি) বলেছেন, ''অধ্যক্ষের সম্মান অর্জন করার দরকার আছে। এই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। তাই অধ্যক্ষের এটা নাটক। এছাড়া এই অধ্যক্ষ প্ররোচনা দিচ্ছিলেন।''

অধ্যক্ষ নিগ্রহ সম্পর্কে রাজ্যপাল রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধে বলেছেন। ইতিমধ্যেই অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক ব্যবস্থা রাজ্যপাল তথা আচার্য-কে দিয়ে করানো হয়েছে। এসব ব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তরের সর্বেসর্বা হয়েছেন ব্রাত্য বসু। বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরে প্রথমে মন্ত্রী করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। তাঁর সততার তুলনা নেই। তিনি সরকারি মোবাইলটা পর্যন্ত অফিসে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। তাঁকে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে কৃষিমন্ত্রী করা হলো। শোনা যাচ্ছে, রবীনবাবুকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়াও হতে পারে। তৃণমূল নেত্রী গোড়া থেকেই নিজের কথা যাঁরা শুনবেন না তাঁদের পাত্তা দেননি। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দেননি— তারক ব্যানার্জী বা স্বপন সমাদ্দারকে। প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী কাশীনাথ মিশ্রকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়নি। মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি হাওড়ার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী জাতীয় শিক্ষক ব্রজমোহন মজুমদার। অবিচারের তালিকা অনেক বড় করা যায়। তৃণমূল দলের মধ্যেই এ নিয়ে ক্ষোভ। কবীর সুমন এই অবস্থার প্রতিবাদ করে একটা গানে লিখেছেন— 'বিলাত করার দরকার নেই— চাষিদের স্বার্থ দেখুন। যারা মা-মাটি-মানুষ গড়ে তুলছে।'

ধান-আলু-পাট চাষিদের সমর্থনে কংগ্রেস সমাবেশ করছে, তৃণমূল-এর নীতির সমালোচনা করছে। এর জবাবে নেত্রী বলেছেন— 'দরজা খোলা আছে, বেরিয়ে যেতে পারে।' পরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে সমালোচকদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বাবু চলে বাজার মে, কুত্তা ভোঁকে হাজার।' এটি একটি হিন্দী প্রবচন। এর শেষে আছে 'শালো কুত্তাকো ভোঁকনে দেও।' এটি অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বলেননি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'উন্নয়ন হবেই যতই বাধা আসুক।' উন্নয়ন নিশ্চয় প্রয়োজন, কিন্তু উন্নয়নে জনসাধারণকে সামিল করার ব্যবস্থা কোথায়? জনসাধারণকে উজ্জীবিত এবং উৎসাহী করতে হবে। যে জনসাধারণ এই পরিবর্তন এনেছেন তাঁরাই তো উন্নয়নের ভিত্তি। সেই মানুষজনকে জমায়েত করতে পারলে 'প্রকৃত' উন্নয়নকে বাধা দিতে কোনও বিরোধী শক্তিই সাহস করবে না। তৃণমূল-চালিত সরকারের পক্ষ থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা-কর্মসূচী নিয়ে সর্বদলীয় আলোচনা করছেন না কেন? এটাতো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো ব্যবস্থা। বুদ্ধদেববাবু নিজের পার্টিকে, পার্টির জেলা কমিটিকে না জানিয়ে সর্বদলকে অবহেলা করে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম করতে গিয়ে তিন দশকের রাজ্যপাঠ থেকে অপসৃত হলেন। ইতিহাসের পরিহাস বড়ই নির্মম।

ভূপালে গো-রক্ষা কর্মশালা

মধ্যপ্রদেশের ভূপালে সম্প্রতি 'ভারতীয় গো-বংশ সংরক্ষণ ও সম্বর্ধন' সংস্থার পরিচালনায় এক সর্বভারতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। মধ্যপ্রদেশে গো-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগের কারণে শ্রী চৌহান উপস্থিত অতিথিবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা পান।

কর্মশালায় আয়োজকদের তরফে গো-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ভারতীয় সমাজ ও জীবনযাত্রার ধারায় গো-দুগ্ধ ও গোময়ের উপকারিতা সম্পর্কে তাঁদের দাবী—

(১) ১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শোনা গেছে— যে সমস্ত মানুষজন গোময়লেপিত ঘরবাড়ীর মধ্যে ছিলেন গ্যাস নির্গমণের বিষময় প্রভাব তাদের ওপর পরিলক্ষিত হয়নি।

(২) গোময় সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তা পারমাণবিক বিকিরণ ক্রিয়া আটকাতে পারে।

(৩) সময় মতো গোময়ের ব্যবহারে এখনকার প্রসবের ক্ষেত্রে চটজলদি সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না।

(৪) বিদেশী হাইব্রীড গোরুর-দুধ অপেক্ষা দেশী গোরুর দুধ সংরক্ষণ বোর্ডের প্রবক্তাদের পক্ষে আরও দাবী করা হয় যে গোরুকে স্পর্শ করা মাত্র মানবদেহে রক্তচলাচলের নিয়ন্ত্রণ সুষম হতে থাকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গো-বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের তরফে সুনীল মান সিং ও অখিল ভারতীয় গো-সেবা সংস্থার মুখ্য অধিকর্তা শঙ্কর লাল। শ্রী লাল বলেন, ১০ গ্রাম গাওয়া ঘি থেকে ১০০ টনের সমপরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। দাবীগুলি নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার মতো।

জলাধার-বিরোধী আন্দোলনে চীনের হাত

''দু'বছর আগেই মাওবাদীরা বৃহৎ জলাধার প্রতিরোধ মঞ্চ গঠন করেছে এবং এই মঞ্চের মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবে অসমে জলাধার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছে।

কেন্দ্রীয় গৃহ-মন্ত্রকের এক গোয়েন্দা রিপোর্টে এই তথ্য-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।'' এমনই মন্তব্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর। গত ১২ জানুয়ারি গৌহাটিতে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলার পাশাপাশি এর পেছনে চীনের হাত রয়েছে বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি। সাধারণত অনুপ্রবেশ সহ একাধিক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গগৈ ভারত-বিরোধী অবস্থান নেওয়ায়, তাঁর এহেন চীন-বিরোধী উষ্মা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের তাই বিস্মিতই করেছে। তাঁরা মনে করছেন, অসমের স্বপ্নের প্রোজেক্ট 'বৃহৎ জলাধার প্রকল্পে' চীনের বিরোধিতার হাত থাকার অভিযোগ অসমের রাজ্যপাল জে বি পট্টনায়ক করতেই প্রথমবার এনিয়ে সরাসরি মুখ খুলতে বাধ্য হলেন গগৈ।

নিউক্লিয়ার অস্ত্র

পাক-চীনের যৌথ হুমকি— যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনীকে পরাস্ত করতে কৌশলগত নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে কুণ্ঠা করবে না তারা। এহেন হুমকির কারণ ভারত নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে ওরকম ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এর জবাবে সেনাপ্রধান জেনারেল ভি কে সিং গত ১৫ জানুয়ারি ৬৪তম সেনা দিবসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নিউক্লিয়ার অস্ত্র যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নয়। এর একটা কৌশলগত তাৎপর্য রয়েছে এবং এখানেই বিষয়টা চুকে যাওয়া দরকার। তবে চুকিয়ে দেওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না পাক-চীনের তরফে। যদিও সেনা-প্রধান জানিয়েছেন, 'আমি এবং আমার সেনাবাহিনীর কার হাতে নিউক্লিয়াস অস্ত্র থাকল, না থাকল তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা জানি আমাদের কি কর্তব্য ও সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।''

সঙ্ঘের দক্ষিণ বীরভূম জেলার প্রশিক্ষণ শিবির

বীরভূম জেলার কীর্ণাহারে গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আর এস এসের শাখাটোলী প্রশিক্ষণ শিবির। দক্ষিণ বীরভূম জেলার প্রায় ৫১টিস্থান থেকে আসা বালক, কিশোর কার্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে কীর্ণাহারের মতো একপ্রকার নতুন স্থানে এই শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজনের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষত পথসঞ্চলনের সময়। স্থানীয় মানুষজন স্বয়ংসেবকদের পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। প্রকাশ্য কার্যক্রমে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শারীরিক কার্যক্রম প্রদর্শন করেন এবং শেষে সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক ডঃ বিজয় আঢ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে সঙ্ঘের কাজ ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে কিভাবে বিস্তার লাভ করছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে তা উল্লেখ করেন। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকমার দাস তাঁর সভাপতির ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে সঙ্ঘ কাজের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

শোক-সংবাদ

গত ২৯ ডিসেম্বর আসানসোলের রমেন ভট্টাচার্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। সঙ্ঘের প্রাক্তন বিভাগ প্রচারক দেবতনু ভট্টাচার্যের তিনি পিতৃদেব। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। রমেনবাবু ছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং বিজেপি-র কার্যকর্তা। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্যও বর্তমানে রাজ্যস্তরের বিজেপি-র একজন নেত্রী।

***

গত ৩০ ডিসেম্বর রাতে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আসানসোলে পরলোক গমন করেছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আসানসোল মহকুমার তিনি প্রাক্তন সঙ্ঘচালক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। আসানসোল বিবেকানন্দ সার্ধশত জন্মবার্ষিকী সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে বরাবর তিনি নিজেক যুক্ত রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বার্নপুরে ইস্কো-র উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। চার পুত্র ও তিন কন্যাসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু তিনি রেখে গেলেন।

জাগতিক মৃত্যুর আগেই মৃত্যুদণ্ড নেতাজীকে

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

ছোটবেলাতেই শুনেছি তাইহোকুতে একটা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে। বিমানযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হবিবুর রহমান ফিরে এসে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছেন এবং মহা উৎসাহে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহ্রু সেই কাহিনী প্রচার করেছেন।

কিন্তু দেশের অগণিত মানুষ সেটা বিশ্বাস করেননি। তাঁদের চাপে নেহ্রু ১৯৫৬ সালে শাহ্নওয়াজ-কমিশন গঠন করেছেন একটা তদন্তের জন্য, আর ১৯৭০ সালে ইন্দিরা গান্ধী করিয়েছেন খোসলা কমিশন। দুটো কমিশনই সেই মৃত্যুকাহিনীটা মেনে নিয়েছিল আর তাতে মানুষের মনে বেড়ে গিয়েছিল হতাশা ও দুঃখ।

দুটো কমিশনে যে সত্তর জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁদের কথায় কিন্তু নানা ধরনের অসংলগ্নতা, বিভ্রান্তি, পার্থক্য ও পরস্পর-বিরোধিতা ছিল। সেই জন্য সেই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল। শাহ্নওয়াজ কমিশনের অন্যতম সদস্য সুরেশচন্দ্র বসুর মনে হয়েছে— ওই ধরনের কোনও ঘটনাই ঘটেনি—'The aircraft accident and the incidents subsequent to that did not take place and the evidence adduced there on is concocted and false—' (ডিসেসিয়েন্ট রিপোর্ট, পৃ: ১৪৩)। বিমানে কে কোথায় বসেছিলেন, বিমানটা কেন তুরিনে গেল, সেখানে তাঁরা কোথায় উঠেছিলেন, নেতাজী তখনও সেখানে ছিলেন কিনা, তাইহোকুর কোথায় বিমানে আগুন লেগেছিল, বিমানের কি ধরনের ক্ষতি হয়েছিল, নেতাজীর কতটা পুড়েছিল বা আঘাত লেগেছিল, তাঁদের কিসে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল, নেতাজী আলাদা ঘরে ছিলেন কিনা, নেতাজীর কোট খুলে দিয়েছিলেন কে, তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন কিনা— এই সব বিষয়ে নানা ধরনের ও বিভ্রান্তিকর উত্তর দিয়েছেন সাক্ষীরা। আর সাংবাদিক হারিন শা দুই ডাক্তার ইয়োসিরি ও সুরুতা এবং নার্স পান পিসার কাছ থেকে পেয়েছেন অসংলগ্ন ও বিপরীতধর্মী বিবৃতি—(ভার্ডিক্ট ফ্রম ফরমোজা)।

আরও মনে রাখতে হবে— নেতাজীর কোনও ডেথ্-সার্টিফিকেট পায়নি কোনও কমিশনই। মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডও নেই। মৃতদেহের ফটোও কোথাও পাওয়া যায়নি। হবিবুরও মৃত্যুশয্যায় ছিলেন না— তিনি অজ্ঞান অবস্থায় নাকি তখন ছিলেন, পরে শুনেছেন নেতাজীর অন্ত্যেষ্টিও হয়ে গিয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়— দুটো কমিশনের কাজ ও হারিন শা-র অনুসন্ধানের ফলে রহস্যটা আরও জমাট বেঁধেছে। তাৎপর্যের বিষয় হলো— সেদিন হাসপাতালে একজন জাপানী সৈনিকেরই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর নাম ইচিরো ওকুরা। ডাক্তার ইয়োসিরি এবার মুখার্জী-কমিশনকে জানিয়েছেন যে, তিনি নেতাজীর নামে একটা ডেথ্-সার্টিফিকেট লিখেছেন ১৯৮৫ সালে। সেটা এত বছর পরে কেন এবং কার কথায় তিনি সেটা লিখেছেন, তা অতি বৃদ্ধ ডাক্তার স্মরণ করতে পারেননি।

এই সব কারণে জনতা সরকারের আমলে— ১৯৭৮ সালে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই দুটো কমিশনের রিপোর্টই বাতিল করে দিয়েছিলেন। সেটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিছু প্রশ্নের কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি—

(১) নেহ্রু হঠাৎ ১৯৫৪ সালের ২৯ আগস্ট বলে বসলেন, ঘটনাস্থল হলো জাপান (অমৃতবাজার, ৩০.৮.৫৫)! জাপানের ভূমিকা কি ছিল?

(২) নেতাজীর সহকর্মীদের স্থানীয় জাপ-কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন— তাঁদের গন্তব্যস্থল হলো জাপান। কিন্তু এস এ আয়ার লিখেছেন, তাঁদের ধারণা ছিল নেতাজী চলেছেন দাইরেনের দিকে— রুশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য (সিলেক্টেড স্পীচেস অফ সুভাষচন্দ্র, ভূমিকা)। জাপ-কর্তৃপক্ষ নেতাজীর জন্য একটাই আসন দিতে চাইল কেন? অনেক অনুরোধে বেড়েছে আর একটা আসন হবিবুরের জন্য। অন্যান্যদের কথা হলো— পরে তাঁদের জাপানে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৯ আগস্ট বলা হলো, একজন নেতাজীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তখনই বিমানে জাপানে যেতে পারবেন, অন্যান্যদের যেতে হবে দু-একদিন পরে। এস এ আয়ার তখন বিমানে উঠেছেন এবং একটু পরে শুনেছেন, আগের দিনই নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে। তাহলে তাঁদের কেন ১৯ তারিখে বলা হলো, তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন জাপানে (আয়ার— আজাদ হিন্দ ফৌজ, পৃ: ৯৭)।

(৩) সেই বিমান যদি জাপানের উদ্দেশ্যে ১৬ আগস্টে ছাড়ে, তাহলে ১৮ তারিখে সেটা তাইহোকু গেল কেন? বিমানের রুট্টা কি ছিল?

(৪) ২৩ তারিখে জাপ্-বেতারে বলা হলো টোকিওর এক হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। তাহলে তাইওয়ানের পত্রিকা 'শিব্ পাও' কেন লিখল— সেই মৃত্যুটা ঘটেছে স্থানীয় হাসপাতালে ('in a local hospital')? আর বেতারের জন্য সংবাদ খসড়াটা আয়ারকে লিখতে হলো কেন? বেতারের কর্মী ছিলেন না? আয়ার তো সেখানে তখন ছিলেনই না।

(৫) নেহ্রু ১৯৫২ সালের ৫ মার্চ হরিবিষ্ণু কামাথের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, নেতাজীর মৃত্যুটা সংশয়াতীত সত্যি ('settled beyond doubt')। তাহলে ১৯৬২ সালের ১৩ মে তিনি কেন নেতাজীর অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুকে লিখেছেন— সেই মৃত্যু সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ ('precise and direct proof') তিনি দিতে পারছেন না? তাহলে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তিনি আগে কামাথকে ওই কথা

বলেছিলেন?

(৬) মার্কিন গোয়েন্দারা তাইহোকু কাহিনীটা বিশ্বাস করেননি। একটা রিপোর্টে আছে---'Habibur's report is unsatisfactory।' আর অনেক পরে— ১৯৪৬ সালের ১ মার্চ বৃটিশ গোয়েন্দারা জানিয়েছেন— ঘটনাটা যদি প্রচারধর্মী হয়ে থাকে— তাহলে সেটা বেশ চাতুর্যের সঙ্গেই সাজানো হয়েছে।

দেখা যাক ভারতের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কি ভাবছিলেন। বড়লাট ওয়াভেল তাঁর ডায়েরীতে 'ভাইসরয়'স জার্নাল' ২৮.৮.৪৫ ও ২২.৯.৪৫-এ লিখেছেন, তিনি সেটা বিশ্বাস করেন না— মনে হয়, সুভাষচন্দ্র তাঁর কাজ শেষ করার জন্য ওই কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর শেষ ইংরেজ-বড়লাট মাউন্টব্যাটেন আমাদের হাইকমিশনার এন জি গোরেকে লিখেছেন— এই ব্যাপারে কোনও প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। তাহলে নেহরু তারস্বরে ওই কাহিনীটা প্রচার করেছেন কেন?

(৭) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল টোকিও ট্রায়ালের অন্যতম বিচারক হিসেবে দীর্ঘদিন জাপানে ছিলেন। তার ফলে নেতাজী সম্বন্ধে বহু তথ্য তাঁর কাছে এসেছিল— বিশেষ করে, মার্কিন বিচারকরা তাঁকে বলেছিলেন, তাঁদের দেশ তাইহোকুর কাহিনীটা আদৌ বিশ্বাস করে না। তার ফলে তিনি এই নিয়ে একটা তদন্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু ১৯৫৬ সালে তদন্তের জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেনাপতি শাহ্নওয়াজকে। এটা সৈনিকের কাজ নয়, কাজটা বিচারকের। কমিশনের অন্যতম সদস্য সুরেশচন্দ্র বসু জানিয়েছেন, শাহনওয়াজ সাক্ষীদের ধমক দিতেন এবং নিজের কথা তাঁদের মুখে বসাতেন। তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন জাগবেই, কারণ পরে তিনি হয়েছেন রেলমন্ত্রীর সংসদীয় সচিব। খোসলাও নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

(৮) নেতাজীর মৃত্যু যদি ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট ঘটে থাকে, তাহলে ২৪ অক্টোবরের (অর্থাৎ ৬৭ দিন পরের) একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক। বড়লাটের শাসনপরিষদের হোম মেম্বার ডি. এফ. মুডী একটা নোট তৈরি করেছেন নেতাজীকে নিয়ে কি করা যায়, তা নিয়ে। তাতে ছিল কয়েকটা বিকল্প— 'সেখানেই' তাঁর বিচার করা, দেশে এনে শাস্তি দেওয়া, কোনও নিরপেক্ষ দেশে বিচার করা ইত্যাদি। সব শেষে আছে— সব চেয়ে ভাল, 'Leave him where he is and don't ask for his surrender।'

তাহলে তখন কি কোনও মিত্র-দেশে বন্দী অবস্থায় ছিলেন? সেটা জাপানে, নাকি রাশিয়ায়? প্রাক্তন সাংসদ ডঃ সত্যনারায়ণ সিংয়ের মতে, নেতাজী রাশিয়ায় বন্দী অবস্থায় ছিলেন। নেতাজী-গবেষিকা ডঃ পূরবী রায়ও প্রমাণ পেয়েছেন, নেতাজী ছিলেন রাশিয়ায়। এই ব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের জন্য দরকার রাশিয়ান আর্কাইভে খোঁজ-খবর করা, আর তার জন্য প্রয়োজন ভারত-সরকারের অনুমতি-পত্র। কিন্তু কেউ তাঁকে সেটা দেয়নি। কেন?

(৯) নেহরু তদন্ত-কমিশন বসিয়েছেন ১৯৫৬ সালে, ইন্দিরা গান্ধী বসিয়েছেন ১৯৭০ সালে। স্বাধীনতার (১৯৪৭) অব্যবহিত পরেই সেটা করার কথা, সেটা যথাক্রমে ১১ ও ২৫ বছর পরে কেন করা হলো? ইতিমধ্যে সেই বিমান-যাত্রীদের অনেকের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে, সাজানো সাক্ষীরা আবোল-তাবোল বলেছেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল 'either loot or misplaced'। রহস্যভেদ হবে কেমন করে?

(১০) ১৯৯৫ সালে জাপানের রেনকোজী মন্দির থেকে 'নেতাজীর' চিতাভস্ম আনার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই চিতাভস্ম তাইহোকু থেকে জাপানে গেল কেমন করে? কে নিয়ে গেলেন সেগুলো? স্যাফ্লি-কমিশন জানিয়েছিল, সেগুলো কার, সেটা জানা যায়নি। মার্কিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা নাকি বলেছেন, সেগুলো কুকুর-শেয়ালেরও চিতাভস্ম হতে পারে। ভারত-সরকার সেগুলোর জন্য এত ব্যগ্র হলো কেন?

(১১) বিমানযাত্রার আগের দিন নেতাজী জন্ এ থিবিকে লিখেছেন— একটা দুর্ঘটনাও তো হতে পারে— 'who knows an accident may not overtake me?' যাত্রা শুরুর আগেই এই আশঙ্কা কেন? তাহলে কি পরিকল্পনাটা তাঁরই? কাজের সুবিধের জন্যই এই কৌশল?

(১২) সব চেয়ে বড় কথা---মুখার্জী-কমিশনকে তাইহোকু সরকার বলেছেন, নেহরুর আমলেই তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল ১৮ আগস্ট (১৯৪৫)-এর আগে-পরে মাস কয়েকের মধ্যে সেখানে কোনও বিমান-দুর্ঘটনাই ঘটেনি। যেটা ঘটেনি, সেটায় নেতাজীর মৃত্যু হলো কেমন করে?

বলা বাহুল্য, নেহরু এই কথাটা চেপে গিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তাঁর না হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল, অন্যান্য কংগ্রেসী-প্রধানমন্ত্রীদেরও দলীয় বাধ্যবাধকতা ছিল— কিন্তু অন্যান্য অ-কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীরাও এই মিথ্যাচারটা উন্মুক্ত করলেন না কেন? কেনই বা আলোচনা ছাড়াই একলহমায় বর্তমান সরকার মুখার্জী-কমিশনের বক্তব্য নাকচ করে দিল? তাইহোকু-কাহিনীকে সাজানো বলার কারণে? কার পাপকে চাপা দেওয়ার জন্য এই মিথ্যাচার? এর ক্ষমা আছে কোনও?

মুখার্জী-কমিশন ২০০৫-এর ৮ নভেম্বর তার রিপোর্ট জমা দিলেও সরকার এই নিয়ে কিছু করেনি। ২০০৬ সালের ১৬ মে তারিখে সরকার জানিয়েছে যে, নেতাজী সেই বিমান-দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছেন এবং রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম তাঁরই (অ্যাক্শান টেকেন রিপোর্ট)। এটা অবশ্যই এক তাজ্জব ব্যাপার। তাইহোকু-সরকারই জানিয়েছে— ওই সময় কোনও বিমান-দুর্ঘটনাই ঘটেনি। আর আমাদের সদাশয় সরকার এখানে বসেই জেনেছে যে, দুর্ঘটনাটা ঘটেছে এবং তাতেই নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে!

আরও অদ্ভুত ব্যাপার— সেই চিতাভস্ম সম্ভবত কুকুর-জাতীয় প্রাণীর (শ্যামল বসু— সুভাষ ঘরে ফেরে নাই)। কিন্তু এই সরকার জেনে গিয়েছে সেগুলো নেতাজীরই।

এমন অদ্ভুত সরকার পৃথিবীর কোন দেশে আছে?

মুখার্জী-কমিশন আরও জানিয়েছে---সম্ভবত অন্যভাবে নেতাজী মৃত, তবে এই ব্যাপারে পৃথক তদন্ত হওয়া দরকার। কিন্তু মনমোহন-সরকারের মতে, তাইহোকুতে মৃত নেতাজীকে নিয়ে আর কোনও তদন্ত হবে না।

এই সরকারের এক মুহূর্তও ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার আছে? আগেই নেতাজী সিঙ্গাপুরে বলেছিলেন— 'এই মহা-সংগ্রামের পরে কে আমরা রইলাম, কে মৃত্যুকে বরণ করলাম— সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো— আমরা দেশের জন্য সব দিতে পেরেছিলাম'।

তিনি পা বাড়িয়েছিলেন মৃত্যুর অমৃতপথে— তিনি মৃত্যুত্তীর্ণ মহাপুরুষ। আমরা কল্পিত কাহিনী দিয়ে তাঁর জাগতিক মৃত্যুর আগেই কিন্তু তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।

।। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত।।

চীনের বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারের অধীন

অতিথি কলম

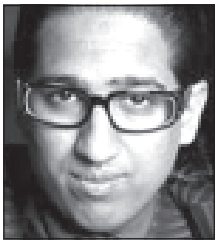

অরিন্দম চৌধুরী

সম্প্রতি চীনের ইউ (yiwu) শহরে দু'জন ভারতীয় ব্যবসায়ীকে চীনা সরকার যে ভাবে একতরফা আটক করে রেখেছিল এবং ভারতীয় কূটনীতিক তাদের মুক্তির ব্যাপারে সচেষ্ট হলে তাঁদের খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিতে যেভাবে অস্বীকার করে তা চীনের প্রচলিত আইনব্যবস্থার নিম্নগামিতার অভ্রান্ত নির্দেশক। বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সিটির বর্ণনাটি বিচার্য। ভারতীয় কূটনীতিক বালচন্দ্রনকে আহার্য তো দেওয়া হয়ইনি, উপরন্তু তিনি ডায়াবেটিসের রুগী হওয়ায় বারবার একান্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ চেয়েও পাননি। পরিণামে তিনি আলোচনার টেবিলেই সংজ্ঞা হারান ও কেবলমাত্র তখনই তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিনা বিচারে আটক হওয়া দুই ভারতীয় ব্যবসায়ীর মুক্তির ব্যাপারেই তিনি সওয়াল করছিলেন। ইয়েমেনী যে

সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে চীনের বিচারব্যবস্থা। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার বিচারালয়গুলি। সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার কোনও বিভাজন মানা হয় না। কোনও বিশেষ ক্ষমতা আদালতের নেই। ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেস (এন পি সি) সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। তারা যে কোনও সময় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। বিচার-ব্যবস্থায় সব রকমের নিয়োগই (বিচারক ও জুরি) এই এন পি সি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রত্যাশিতভাবে পক্ষাপাতদুষ্ট এই ব্যবস্থা ন্যায়বিচার কখনই দিতে পারে না।

২০১১ সালের নভেম্বর মাসে চীনের কম্যুনিকেশন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগীয় অধ্যাপক ওয়াং সিস্কিন মন্তব্য করেছিলেন, ''ভারতবর্ষের আইনী পরম্পরা অনুযায়ী একজন বিচারক মনে করলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও রিপোর্ট বা কোনও আবেদনকারীর (তিনি যে উকিল হবেনই এমন কোনও কথা নেই) আবেদনের ভিত্তিতেই মামলা শুরু করতে পারেন। চীনকে অবশ্যই এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে।'' এই পরামর্শ চীনের মতো একটি দেশে যেখানে বাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার প্রায় অপহৃত আর আইন ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারি একনায়কতন্ত্রের অধীন সেখানে তাদের পক্ষে কতটা যুক্তিসঙ্গত মনে হবে বলা মুশকিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইউ সংস্থায় ওই দুই অপহৃত ভারতীয় কাজ করতেন তাদের সঙ্গে লেনদেনে অসুবিধে সৃষ্টি হওয়ার কারণেই তাদের দুই কর্মীর এই বিনা বিচারে অপহরণ।

চীনা সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সেদেশের বিচার বিভাগের এই অমানবিক ও জঘন্য আচরণ চৈনিক প্রশাসনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ঘৃণ্য প্রতিফলন। একটি উদাহরণ দিলেই চীনের দৃষ্টিভঙ্গির নৃশংসতা ও অত্যাচারী মানসিকতা পরিষ্কার হবে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গ্রামে কোনও চৈনিক পরিবারে একের অধিক সন্তান জন্মানোর খবর পেলেই সরকারি ট্রাক্টর গিয়ে সেই পরিবারের বাড়ি ধূলিসাৎ করে দিত। বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য পরিবারগুলি কোনও আইনী সহায়তা কখনই পেত না। চীনের বিচারবিভাগ কোনওদিনই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিচারবিভাগের কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৯৭৬-এর পর বিচার প্রথার কিছুটা পুনরুজ্জীবন করার চেষ্টা হয়। ১৯৮০ সালে 'অরগ্যানিক ল অফ পিপলস কোর্ট'-এর এক্তিয়ারের মধ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন হয়েছে। এরই ফলে বিচার প্রক্রিয়ায় ও ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটবে এমনটাই ভাবা গিয়েছিল। আর সেই অনুযায়ী ভাল দিক বলতে গোটা দেশকেই একই আইনী প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে আনা গেল। ফলশ্রুতি হিসেবে বিচারক ও সহকারী বিধায়ক নিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি নজরে আসে। ৮০'র দশকে বিচারকের সংখ্যা ৫০,০০০ হাজার থেকে ৯০'র দশকে ১ লক্ষ ৩২ হাজারে পৌঁছয়। আবার নতুন শতাব্দীতে সংখ্যাটা ৪১৬ শতাংশ বেড়ে ২ লক্ষ ৫৮ হাজারে পৌঁছে যায়। এর ফলে এখন জনসংখ্যা অনুপাতে চীনে বিচারকের হার প্রতি ৮৬০০-য় ১ জন যা আমেরিকান অনুপাত ৮৮২৬'য় ১ জনকেও ছাড়িয়ে গেছে। হায়! আমরা ভারতে ৬৪ বছর ধরে এমন স্বপ্নই দেখে আসছি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এমন আকর্ষণীয় সংখ্যা অনুপাত ও বিপুল পরিকাঠামোগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চীনের বিচার ব্যবস্থা এমন সব সমস্যা আক্রান্ত যা তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান করে তোলে। ব্যবস্থাটি স্বাধীন তো নয়ই আর হলেও বাস্তবে তার অবস্থান স্বাধীন কিনা তা যাচাই করার আদৌ কোনও সমান্তরাল ব্যবস্থাই নেই। একদলীয় সরকার তার প্রভাব খাটিয়ে বিচারবিভাকে কখনই নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন থাকতে দেয় না। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি সদাসর্বদা আদালতের কাজকর্মের ওপর নাক গলায় ও ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। বাস্তবিক, একটি আদ্যন্ত অগণতান্ত্রিক ধাঁচার পক্ষে কখনই কোনও মুক্ত ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থার মর্ম বোঝা সম্ভব নয়। এছাড়া, বিচারবিভাগের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও কোনও সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয় না। বেজিং, সাংহাই, গোয়নডঙ-এর মতো উন্নত শহরগুলির ক্ষেত্রে যে অর্থ অনুমোদিত হয় অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত নগণ্য।

তুলনামূলকভাবে পরিকাঠামো, যাতায়াত ব্যবস্থা ও মাসমাইনে বেশি হওয়ায় সেরা বিচারকরা উন্নত শহরগুলিতেই ভিড় করেন। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি অর্থাভাবের সঙ্গে গুণগতভাবে নিম্নমানের বিচারকদের নিয়েই কাজ চালায়। এভাবেই ন্যায়বিচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই নিকৃষ্ট ব্যবস্থা বলবৎ থাকার ফলশ্রুতিতে অর্থাভাবে পীড়িত অঞ্চলগুলি টাকা জোটাতে মামলা করার খরচা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেয়— যে কারণে বিচারপ্রার্থী খরচার ভয়ে আর মামলা করতেই যান না। সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণ বর্তমানে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বেশ কিছু প্রদেশে বিচার ব্যবস্থা প্রায় লাটে উঠে গেছে। আসলে কোনও প্রদেশ সরকারের সুনজরে আছে বা কতটা বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা তাকে দেওয়া যাবে যে অনুযায়ী নির্ভর করে অর্থ বরাদ্দ। সরকারের এই কৌশলে প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে আর্থিক দুরবস্থার কারণে বিচার ব্যবস্থা শুধু দুর্বলই হয়ে পড়ে না প্রকারান্তরে ন্যায় প্রার্থী— অত্যাচারিত জনগণের দুর্দশার কোনও দায় সরকারকে নিতে হয় না। এই সমস্ত অবহেলিত অঞ্চলে বসবাসকারীদের ওপর তাই যথেচ্ছ অত্যাচার চালানো সহজ হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে বিচারব্যবস্থা অর্থনীতির এক মেরুদণ্ড হিসেবেই পরিগণিত হয়। এটিকে পক্ষপাতমুক্ত রাখতে সবরকমের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিহার করে স্বাধীনচেতা রাজনৈতিক আনুগত্যহীন (তা সে শাসক বা বিরোধ যাই হোক) বিচারক নিয়োগই গৃহীত নীতি। এই দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে চীনের বিচারব্যবস্থা। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার বিচারালয়গুলি। সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার কোনও বিভাজন মানা হয় না। কোনও বিশেষ ক্ষমতা আদালতের নেই। ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেস (এন পি সি) সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। তারা যে কোনও সময় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। বিচার-ব্যবস্থায় সব রকমের নিয়োগই (বিচারক ও জুরি) এই এন পি সি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আক্ষরিক অর্থে শাসক দলই নির্ধারণ করে বিচারক কে হবেন আর অভিযোগকারীই বা কি ন্যায় বিচার পাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনে কোনও ব্যক্তির বিচারক হতে গেলে প্রথমেই রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য প্রধান বিচার্য বিষয়। এমন পরিস্থিতিতে বিচারকদের মূল দায়িত্বই হলো দলীয় নেতৃত্বের আদেশগুলি যথাযথ পালন করা ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করে যাওয়া।

উল্লেখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী এটা দেখা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিচারকদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে চীনের বিচারকরা নামকে ওয়াস্তে কিছু রুটিন কাজ করেন। এমনটাও বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিচারক তাঁর কর্মজীবনে স্বাধীনভাবে কোনও রায়দানই করেননি। আদতে তিনি একজন দলীয় কর্মী হিসেবেই কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁকে গালভরা বিচারক নামে ডাকা হয়। এই ভাবেই চীনে উল্লেখিত ২ লক্ষ ৫৮ হাজার বিচারক ঘুরে বেড়াচ্ছেন আদতে যা বিচারব্যবস্থার নামে একটি প্রহসন মাত্র।

মজার ব্যাপার হলো সুপ্রিম পিপলস কোর্টকে নিয়মমাফিক বার্ষিক রিপোর্ট এন পি সি-কে দিতে হয়। এন পি সি যেগুলিকে বিবেচনা করে অনুমোদন দেয়। এর থেকে পরিষ্কার এন পি সি-ই সমগ্র বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে কোনও রায়দানকেই শেষমেষ প্রভাবিত করে। প্রাদেশিক সরকারগুলির যে কোনও বিচারালয়কে নির্দেশ দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে কোনও ভাবে সরকারকে বিপক্ষে যেতে পারে এমন সম্ভাব্য মামলার আবেদনগুলিকে তারা পত্রপাঠ খারিজ করে দেয়। স্থানীয় আদালতগুলি সাধারণ মানুষজনকে ন্যায় বিচার কদাচ দেয় না এবং প্রয়োজনে মামলাগুলিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত করে রাখে। কোনও বিতর্কিত মামলা যদি-বা টিঁকে যায় সে ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতগুলি আগেভাগেই উচ্চ আদালতকে রায়দানের ব্যাপারে সজাগ ও প্রভাবিত করে দেয়। এমন তাজ্জব ব্যবস্থায়, যেহেতু উচ্চ-আদালত আবেদনকারীর অভিযোগ না শুনেই নিম্ন আদালতের অসার যুক্তির ভিত্তিতেই রায়দান করে। ফলে হতভাগ্য অভিযোগকারী ন্যায়বিচার তো দূরস্থান তার বক্তব্য পেশ করা থেকেই বঞ্চিত হয়। চীনে এমন ব্যবস্থাই চলে আসছে।

[লেখক বিশিষ্ট ম্যানেজমেন্ট গুরু ও দ্য সানডে ইন্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক। সৌজন্যে : পাইওনীয়ার]

বই নিয়ে আমাদের মাতামতি কি শুধু বারোদিনের ?

রমাপ্রসাদ দত্ত

'সকলের জন্যে বই' কথাটা বার বার বলা হচ্ছে নানারকমভাবে। বইকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন স্তরে কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বই নিয়ে উৎসব, মাতামাতির মধ্যে সকলকে টেনে আনা যাচ্ছে না— এটা স্বীকার করেও আমরা গ্রন্থকেন্দ্রিক উৎসবের সপক্ষে কথা বলতে পারি। কারণ, এমন উৎসবের প্রয়োজন আছে সবসময়। বই সকলের হাতে যাতে পৌঁছে যায় সেজন্যে চাই ধারাবাহিক উদ্যোগ। বারো দিন বই নিয়ে উৎসব হলো ঘটা করে সব ধরনের প্রচারের ঢাক বাজিয়ে। তারপর বছরের ৩৫৩ দিন বইয়ের জন্যে ভাবনা থাকছে অবশ্যই। তার মধ্যে হিসেবি অঙ্ক ঠিকমতো রয়েছে। সকলের হিতভাবনার বদলে কয়েকজনের লাভের কড়ির পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারটাই প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণ বইপ্রেমীদের কোনওরকম স্বার্থ দেখার গরজ থাকেনি। বই উৎসবে মেতে ওঠার সময় আলোর ঝলকানিতে ঢাকা পড়ে যায় বইজগতের অন্ধকার দিক। উৎসবের দিন যখন আসে তখন আবেগের তাপ হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন দৃঢ়তর করুক— এটাই যে কোনও স্বাভাবিক মানুষ চাইবেন। প্রাত্যহিক জীবনের সংকট সমস্যা গ্লানি নিরানন্দ হতাশা সব অতিক্রম করে উৎসবের অঙ্গনে এক হওয়ার ব্যাপার থাকে। সেদিক থেকে দেখার অভ্যেস আছে বলেই বারো দিনের বই উৎসব হয়ে ওঠে সারা বছরের প্রেরণার অমূল্য সঞ্চয়।

বহুজনের হিত ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বই-ব্যবসা। লেখক, চিত্রী, বিভিন্ন পর্যায়ের মুদ্রণকর্মী, কাগজওয়ালা, দপ্তরীখানা--- প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে। বই তৈরি করে তা পৌঁছে দেওয়ার কথা পাঠকের কাছে। তাঁদের জন্যেই সমস্ত আয়োজন। পাঠকের কাছে ঠিক বইটি যাতে বিনা বাধায় ঠিকভাবে পৌঁছোয়— সেজন্যে ভাবনা-চিন্তা কম নয়। সমবেত কাজের সঙ্গে ভালোবাসা যুক্ত হোক-বা না হোক পেশাদারি নিষ্ঠা, নৈপুণ্য থাকলে বই-চিত্র অন্যরকম হয়ে ওঠে। জেগে ওঠে আশার আলো, আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে জীবনে। ক্ষণকালের হলেও গতানুগতিকতার বাইরে যাওয়ার আন্তরিক তাগিদ আর আবেগ স্বতন্ত্রমাত্রা পায়। যেভাবে শারদ-উৎসব স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে বই-উৎসব সেরকম আবহাওয়া নিয়ে আসে প্রতিবছর কয়েকটা দিনের জন্যে। সকলে বইপ্রেমী নন, কেউ কেউ বইপ্রেমে মেতে উঠতে চান। বই-উৎসব হয়তো কিছুটা প্রাণিত করে সেই বইপ্রেমীদের। ডাক দিয়ে বলে, 'বই-উৎসবের ডাক পেয়েছো, হৃদয় জুড়ে বই প্রেমের বন্যা যদি এসময় না বয়ে যায়, কখন তুমি জাগবে!' একে অন্যের দেখাদেখি মেতে ওঠার ব্যাপার থেকে যায়। বই-উৎসব সম্পর্কে এমন কথাটাই বার বার মনে হয়। অনেকরকম খারাপ ছবি দেখে মন ভার হয়ে ওঠে যখন ঠিক সেই সময়ে উৎসবের সুর একটু অন্যভাবে জীবনকে ঝাঁকিয়ে দিতে চায়। বই উৎসবের চুলচেরা বিশ্লেষণের বদলে আমরা উৎসবের সামগ্রিক রূপটাকেই মর্যাদা দিয়ে মনের গভীরে গ্রন্থ প্রেমের সূক্ষ্ম তারের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধন গড়ে তুলতে পারি। বই-উৎসবের সেটাই তো বড়ো প্রাপ্তি।

ছাপাখানা আসার আগে বই সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপার ছিল না। চিন্তাভাবনা লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল কিছু মানুষের মধ্যে। তাঁরা যা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন তাতে ভাগ বসাবার অধিকারী ছিলেন না সকলে। আমাদের দেশে ছাপাখানা আসার পর বইয়ের অন্যজগত এসে গেছে সামনে। বই তৈরির কাজ ধাপে ধাপে এগিয়েছে। দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে মুদ্রণশিল্প। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকাশন জগত। বিচিত্র বিদ্যাকে সাধারণের নাগালে আনার জন্যে উদ্যোগ চলেছে। মনন চিন্তনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন প্রযুক্তির সাহায্যে। একের পর এক বই বেরিয়েছে। তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। দূর দূরান্তে সাধারণ বিপণি থেকে বই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন প্রকাশকরা। গ্রন্থাগার সর্বত্র গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহ সঞ্চয় ভাগাভাগি করে পড়েছেন গ্রন্থপ্রেমীরা। আমাদের গ্রন্থজগত বরাবরই কলকাতা-কেন্দ্রিক। তার কারণ আছে। কলকাতা সেসময় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগের অনেকরকম অসুবিধে সত্ত্বেও বইকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ছিল আন্তরিকতা। শিক্ষা আর সাক্ষরতা এক জিনিস নয়। তবে শিক্ষা বিস্তার এবং সাক্ষরতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বই-অনুরাগ বেড়েছে। স্মৃতি-শ্রুতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে শিখিয়েছে বই। কলকাতার কোনও প্রবীণ সগর্বে বলেছেন, 'এই বইটি আমার আছে।' জলপাইগুড়ির এক তরুণ বললেন, 'বইটি আমার সংগ্রহেও রয়েছে।' বাংলা বইয়ের প্রচার ও বিক্রি অত্যন্ত সীমিত হলেও এরকম ভালোবাসা রয়েছে বই ঘিরে। সেজন্যেই আমরা গর্ববোধ করি।

গ্রন্থাগার বইকে পৌঁছে দিতে চেয়েছে সকলের নাগালে। ছাপাখানা আসার পরই

গ্রন্থাগার-ভাবনাও আমাদের দেশে এগোয় দৃঢ় পায়ে। গ্রন্থপ্রেমে কোনও খাদ থাকেনি। গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্যে সাধারণ মানুষ সাহায্য করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অনেক নিরক্ষর মানুষও সহায়তা করেছেন সে কাজে। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, এদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তার হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে। সরকারি স্তরে গ্রন্থাগার ভাবনা এগিয়েছে অনেক পরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘোষণা করা হয়েছিল, 'সারা রাজ্যকে জালের মতো গ্রন্থাগার দিয়ে ছেয়ে ফেলা হবে। যদি পাঠক লাইব্রেরিতে আসতে না পারেন, লাইব্রেরি এগিয়ে যাবে পাঠকের কাছে। কেউ যেন

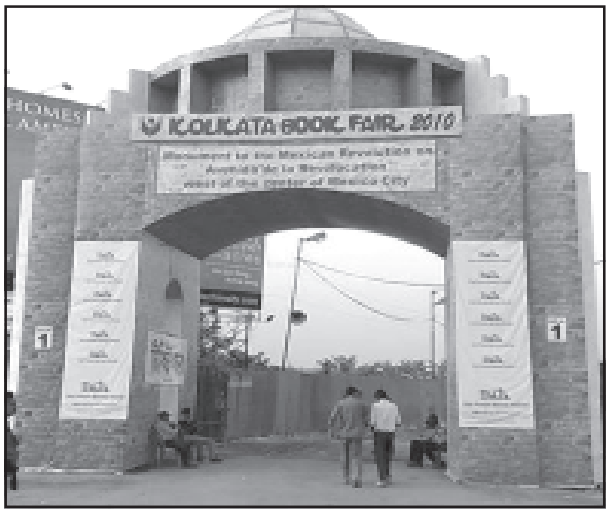

ভুলেও না বলতে পারেন অমুক বইটা আমি পেলাম না, ওই বইটা আমার পড়া হলো না।' বুক মোবাইল সারভিস বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিষেবা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা হলেও তা ঠিকমতো রূপ নেয়নি। কারণ ছিল অনেক। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সদিচ্ছার অভাবই ছিল প্রধান।

১৯৭২ সাল ছিল আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণায় ছিল 'সকলের জন্যে বই।' বইকে ঘিরে অনেকরকম ভাবনা ছিল, তা রূপ নিয়েছিল। আমাদের দেশেও জাতীয় স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয় গ্রন্থ অনুরাগ ও গ্রন্থরুচি সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। বই বর্ষের শেষে একটা বড় মাপে বই-উৎসব হয়েছিল কলকাতায়। উদ্যোগ ছিল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের। কলকাতার মানুষ একসঙ্গে অত বই দেখে মেতে ওঠে। বইউৎসব দারুণ সাড়া পায়। তা দেখে অনুপ্রাণিত হন কলকাতার গ্রন্থজগতের কয়েকজন তরুণ ব্যবসায়ী। তাঁরা বইপাড়ার চেনা চৌহদ্দির বাইরে বইকে নিয়ে গিয়ে উৎসবের আয়োজন করতে চাইলেন। গড়ে উঠল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। ১৯৭৬ সালে প্রথম আয়োজন হলো 'ক্যালকাটা বুক ফেয়ার।' বাংলায় রূপান্তর 'কলিকাতা পুস্তকমেলা।' বই নিয়ে ওইরকম জমজমাট উৎসব আগে কখনও কলকাতায় হয়নি। কলকাতার মানুষ স্বাগত জানাল উৎসবকে। এরপর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সবকিছু বামছাপ দিতে চাইল। কলকাতা বইমেলাকে কোণঠাসা করে সরকারি উদ্যোগ 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা'র আয়োজন করল ঘটা করে। প্রথমে পার্কসার্কাস ময়দানে মেলা আয়োজন করে। পরে ময়দানে গিল্ডের জায়গায় মেলা করতে চাইল। গিল্ড যাতে মাঠ না পায় সেজন্যে নানাভাবে কলকাঠি নাড়া চালিয়ে যায়। গ্রন্থপ্রেমীরা সেসময় লক্ষ্য করেন বামপন্থীদের ওজন করা গ্রন্থপ্রেমের বিচিত্র রূপ। প্রতিবছর সংঘাত চালানোর চেষ্টা থাকে সরকারি তরফে কলকাতা বইমেলার আয়োজক গিল্ডের সঙ্গে। শেষে গিল্ড পার্কস্ট্রিটের মোড়ে একেবারে নতুন জায়গায় জমিয়ে দেয় মেলা। অবশেষে বাম সরকার 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা' বন্ধ করে। কলকাতার গ্রন্থপ্রেমীরা দেখেছেন, সরকারি বইমেলা জনমানসে কোনওরকম দাগ কাটতে পারেনি। অথচ বেসরকারি কলকাতা বইমেলা দারুণ সাড়া ফেলে। এখানেই রয়েছে মূল ব্যাপারটা, সরকারি নীতিনিয়মের সঙ্গে দলীয় মতলবী মানুষরা পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলায় ছড়ি ঘোরানোয় সাধারণ বইপ্রেমীরা হতাশ হয়েছেন। বুঝেছেন, ওই মেলা তাঁদের জন্যে নয়। কিন্তু বেসরকারি কলকাতা বইমেলা প্রথম থেকেই প্রত্যেককে ডাক দিতে পেরেছিল। কলকাতা বইমেলা অনেকরকম টানাপোড়েনের মধ্যে আয়োজন হচ্ছে প্রতিবছর। পায়ের নিচে শক্ত জমি। আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা কোনও গৌরবের ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। এবং যদি আগামী দিনে সরকারি উদ্যোগে কোনও বইমেলার আয়োজন হয় তাহলে মস্ত ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

বই-উৎসব কেমন চেহারা নেবে,— তার একটা পূর্বানুমান থাকলেও সাড়া কেমন মিলবে সেটা আন্দাজ করা গেলেও উৎসবের অঙ্গনের একপাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ ভাবলে আমাদের দুটি প্রশ্ন উঁকি দেয় ঘুরে ফিরে। সর্বজনের উৎসব হলো ঠিকই, কিন্তু বই কি সর্বজনের ভালোবাসার সামগ্রী হতে পারল বছরভর? আমাদের বইপ্রেমের মধ্যে বড় বেশি স্বার্থবুদ্ধি আর লোকদেখানো ব্যাপারটাই প্রবলভাবে ধরা থাকছে?

আমরা দেশের ৮০ কোটি মানুষের হাতে সেল ফোন বা চলমান ফোন পৌঁছে দিতে পেরেছি। বইকে পৌঁছে দিতে পেরেছি কতজনের কাছে? বই-উৎসব কি অল্প কয়েকজনের মাতামাতিতেই আত্মগর্বের জাবর কাটবে? না 'সকলের জন্যে বই' কথাটাকে যথার্থরূপ দেওয়ার জন্যে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ নেবে? ব্যবসা বেড়েছে, বই নিয়ে ভাবনাও। কিন্তু সরস্বতীর প্রসাদ বঞ্চিত কিংবা বই-বিমুখ মানুষদের কি হৃদয় খুলে ডাক দেওয়া যাবে না? বলতে বাধা কোথায়— 'এসো এই উৎসব অঙ্গনে। এই উৎসব তোমারও।' হরেকরকম স্বার্থবুদ্ধির মধ্যে এমন কথা সকলে বলতে পারবো কবে? বারোদিনের বই-উৎসব সেরকম হদিশ দিতে পারছে কি এখনও?

বইমেলার মাঠের অভিজ্ঞতা

নবকুমার ভট্টাচার্য

মনের জানালা খুলে দেয় বই। বইকে বলা হয় জীবনের অন্যতম সঙ্গী। অবসর মুহূর্তে একাকীত্বে বই-ই আমাদের সজীব করে রাখতে পারে। বই পড়ে আমরা জানি অন্তরের গভীরে লুকোনো অন্তরের কথা। মানুষের প্রিয়সঙ্গী বইকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই বইমেলা। এখনতো মহকুমা ও ব্লকে ব্লকেও বইমেলা হচ্ছে। বইমেলা এভাবে ছড়িয়ে পড়ার জন্যেই তা ক্রমাগত জড়িয়ে পড়েছে মানুষের অন্তরে। পুস্তকমেলা নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই পাবলিশার্স গিল্ডের কথা বলতে হয়। আর শুরুর শুরু যাকে বলে তার মধ্যে বিমল ধরের নাম অবশ্যই করতে হয়। তিনিই কলকাতা বইমেলার অন্যতম স্থপতি। কী বিপুল আকর্ষণ তখন বইমেলার। আমি তখন মেলার মাঠের দর্শক। প্রতিদিন নিত্যপুজোর মতো একবার করে মেলার মাঠের আকর্ষণ টানত আমাকে। সেদিনই বুঝেছিলাম আমরা যাঁরা একটু-আধটু লেখালেখি করি, সাহিত্য চর্চা করি তাদের একটা বড় জনসংযোগের জায়গা হচ্ছে বইমেলা। বইমেলায় কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। কত রকমের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এক প্রকাশক বন্ধুর অনুরোধে মেলার ক'দিন তাঁর স্টলেই সেচ্ছাশ্রমে ব্রতী হই আমরা কয়েকজন। বছরের অন্য সময় যেহেতু কলেজ স্ট্রিটে তার দোকানেই আমাদের আড্ডা জমে তাই এক্ষেত্রে আমাদের একটা কর্তব্যও ছিল। তবে এক্ষেত্রে স্টল খোলা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সব দায়িত্ব পড়লো আমারই উপর। সঙ্গী ছিল কয়েকজন। তখন বুঝলাম বইমেলা মানে জমাটি মজা। আর বুঝলাম মেলার মাঠে বই বিক্রি করে লাভ করার জন্য কেউ মাঠে স্টল করে না, সারা বছর বই বিক্রি করার ভিত তৈরি করতে প্রকাশকেরা মেলায় যায়। অনেক প্রকাশক লোকসান হবে জেনেও মেলায় বইয়ের স্টল করে। কারণ তার কাছে এটা একটা বিজ্ঞাপনের জায়গা। তার কাছে এটা যোগাযোগর একটা ক্ষেত্র। তাই প্রকাশকেরা সারা বছর অপেক্ষা করে কলকাতা বইমেলার জন্য।

কলকাতা বই মেলায় কত মানুষ আসে। তবে সবাই বই কেনে না। কেউ ঘুরতে আসে, কেউ খেতে আসে। বই স্টলে এসে কেউ বই দেখে, কেউ পাতা ওল্টায় আবার কেউ কেনে। কেউ কেউ আবার বইয়ের বই তালিকা সংগ্রহ করে। পড়ার পাঠক কমলেও বই বিক্রি চলছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখনও অনেকেই বই কেনেন। ভালো প্রবন্ধের বই বিক্রি কমেনি। মেলার মাঠে যেমন অনেকে বই কেনেন তেমন বই চুরিও হয়। বইমেলা যেহেতু শীতকালে হয় তাই চাদর গায়ে দেওয়া পাঠকদের দিকে দৃষ্টি রাখতে হোত বেশি। অনেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকেও দেখেছি বই চুরি করতে! বই চোর যেমন রয়েছে তেমন চুরি রোখার লোকও রয়েছে স্টলে স্টলে। গগন ভট্টাচার্য এমন এক ছেলে। সারা বছর ঘুরে ঘুরে কলেজে কলেজে ইংরাজী বাংলা বই বিক্রি করে আর মেলার মাঠে কেবল যোগাযোগের জন্য হাজির থাকে। গগনকেও দেখেছি বহু বছর। কে কোন বই কিনতে পারে এবং কিভাবে একজন পাঠককে বই বিক্রি করতে হয় সে দক্ষতা গগনের নখদর্পণে। এমন গগন বইপাড়ায় অনেক রয়েছে তবে এই গগন অন্যরকমের। পুস্তক বিপণীর অনুপ মহিন্দারের স্মৃতিশক্তিকে আমরা অনেকেই ঈর্ষা করতাম। বাংলা প্রবন্ধের বই সব ওঁর নখদর্পণে। কোনও প্রকাশক কোন বই কবে প্রকাশ করেছে, কি তার মলাটের রং, কত দাম সব জানতেন।

কলকাতায় এক সময় দুটি বইমেলা হোত। একটি গিল্ডের উদ্যোগে কলকাতা বইমেলা ও অন্যটি সরকারি উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বইমেলা। একবার পশ্চিমবঙ্গ বইমেলায় স্টলে ছিলাম। সেখানে সারাদিনে বিক্রি হয়নি এমন দিনও গিয়েছে। তবে গিল্ডের বইমেলায় বিল করতে করতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। শেষ দু'দিন তো অসম্ভব ভিড় হয়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল বইয়ের জন্য হাঁটা। আমরা কলেজ স্কোয়ার থেকে হেঁটে মিছিল করে মেলার মাঠে যেতাম। এখানেও গগন ভট্টাচার্য থাকতো সামনের সারিতে। লিটিল ম্যাগাজিনের সন্দীপ দত্তরা থাকতো সামনে। রমাপ্রসাদ দত্ত পোস্টার কার্টুন এঁকে দিত অনেককে। মেলার মাঠে নিত্য বুলেটিন প্রকাশ কেউ করত কোনও না কোনও বছর। রমা দত্তরা যে হুজুগে ইন্ধন দিত। এখনও দেয়। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সুমনের গান সুমনের ভাষ্য' বইমেলায় প্রকাশিত হলো একবার। স্টলের সামনের লাইনে শ' পাঁচেক দর্শক। আমি বিল কাটছি আর সুমন প্রতিটি বইতে অটোগ্রাফ দিচ্ছে। মেলার ক'দিন জমাটি আড্ডা। অবশ্য তখন সুমন চট্টোপাধ্যায় কবীর সুমন হননি, তৃণমূলের জন্মও হয়নি। মেলার মাঠে আগুন লাগার ঘটনা মর্মান্তিক। প্রিয় বইগুলিকে আগুনের হাতে সঁপে দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ক্যাশবাক্স বগলে টিন ভেঙে পালিয়ে আসার স্মৃতি আজও কষ্ট দেয়।

বইমেলার সঙ্গী হয়ে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

''স্থান, কাল আর পাত্র এরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। যদি স্থান কিংবা কাল বদলায়, তবে পাত্রও বদলাবে। ধরুন, আপনি একজন ভারিক্কে লোক, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে গেছেন, তখন আপনার ওজন ২ মন ৩০ সের। সেখান থেকে গেলেন গোঁড়াতলা কংগ্রেস কমিটিতে,— সেখানে ওজন হলো মাত্র ৫ ছটাক, ফুঁয়ে উড়ে গেলেন।'' কথাক'টি স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রয়াত রাজশেখর বসুর। দীর্ঘদিন আগে লেখা তবু আসন্ন বইমেলার পূর্বস্মৃতি মনে আনলে কেমন যেন প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ৭০ দশকের শেষাশেষি যখন বইমেলা প্রথম শুরু হলো, বইপত্রের প্রতি কিছুটা আগ্রহ থাকার সুবাদে বন্ধু-বান্ধব মহলে হঠাৎ-ই আমাদের কদর একটু বেড়ে গেল। অনেকেই কৌতূহলী হলো আদতে ব্যাপারটা কি? মেলা বলতে চড়ক মেলা, রথের মেলা, পুজোর মেলারই গ্রহণীয়তা সার্বজনিক। সেখানে এমন একটি আপাত রসকষহীন ও আমোদ উপকরণ বর্জিত মেলার সার্থকতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই তিন যুগ অতিক্রান্ত করে বাৎসরিক এই উৎসব নিঃসন্দেহে বইপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়াও ১০ দিনের জন্য হলেও মুদ্রিত অক্ষরের দিকে মানুষের টানকে বাড়িয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে যা দীর্ঘস্থায়ীও হয়েছে।

যাইহোক বইপ্রীতির কারণেই প্রথম মেলা থেকেই যাতায়াত করেছি। একসঙ্গে কত বিচিত্র বিষয়ে এত কোটি মুদ্রিত অক্ষরের একই অঞ্চলে সহাবস্থান তখন সত্যিই অবাক করেছিল। একটা সময় ক্রিকেট খেলা যখন আজকের মতো কর্মকর্তাদের টাকা রোজগারের কল হয়ে দাঁড়ায়নি তখন কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ হলে যারা মাঠে খেলা দেখতে যেত, তারা কিছুটা আত্মশ্লাঘার সুরেই পরিচিতকে বলত ''আপনি মাঠে যাননি?'' অনেকটা তেমনই, হ্যাঁ দাদা বই মেলায় যাননি? ব্যাপারটাও এসে গিয়েছিল। আগে বলা ভারিক্কেভাব ভর করাতে কেউ কেউ বই মনোনয়নের ক্ষেত্রে সঙ্গী করে নিত। কেননা তখন বইমেলায় বই কেনাটা আর কিছু নয় রথের মেলার পাঁপরের জায়গা যে নিয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমনি সময়ে নাম শোনা থাকলেও বাঙলাদেশী লেখক আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' নামের আশ্চর্য বইটির সন্ধান মেলাতেই পাই। বাঙালদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেখানকার একেবারে নিম্নবর্গীয় মানুষের ওপর যে কী আলোড়ন এনেছিল তারই একটি মর্মস্পর্শী দলিল বইটি। পরবর্তী সময়ে ওই বিক্ষুব্ধ কালপর্বের ওপর বহু লেখালেখি হলেও অকালপ্রয়াত আখতার সাহেবের বইটি বাঙলা গদ্য রচনায় এক ব্যতিক্রমী ধারার সৃষ্টি করেছিল। এই বাঙলায় অনেক হাবিজাবি বাঙালাদেশী বই পাওয়া গেলেও দীর্ঘদিন বইটি অলভ্য ছিল। বই মেলার কল্যাণে অনেকেই বইটি পড়ে মুগ্ধ হন। আর বইটিকে সনাক্ত করা জনিত কিছুটা অযাচিত গৌরব আমিও পেয়ে যাই।

বইমেলার কথা বললে শুধু বই নয় তার স্রষ্টাদের ব্যক্তিজীবনের কিছু ঝলক দেখার সুযোগও ছিল। যেমন, সম্ভবত ২০০১/০২-এর বইমেলায় প্রয়াত একান্ত মৌলিক লেখক হওয়ার সুবাদে হয়ত কিছুটা জনপ্রিয়তাহীন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া। এক থিয়েটারের গান গাওয়া পরিচিত বন্ধু মেলার মাঠে তাঁকে হঠাৎ পাকড়াও করল ''দাদা আপনাকে সেভাবে মেলায় দেখা যাচ্ছে না''। সেই বছরই তাঁর 'আমি ও নুটবিহারী' নামের নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। অপ্রচলিত ধারার লেখক বলেছিলেন ''ভাই, অ্যাকাডেমি ট্যাকাডেমি ছাড়, আমার বই কেউ পড়ে না, (তীব্র মর্মবেদনা তাঁর কণ্ঠে জড়িয়ে ছিল) মেলায় না এসে এই বইয়ের মরশুমে নিজের লেখাটাই পাঁচবার পড়লাম, অন্তত পাঁচটা পাঠক তো হলো। পাঠের সময় তো আর আমি লেখক নই।'' এতটা তাঁর পাওনা ছিল না। সন্দীপনের বইটি কিন্তু সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে উৎসর্গীকৃত হলেও সেই নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভেই কমরেডদের ব্যাভিচারের ওপর এক ধ্রুপদী কষাঘাতে নির্মম। আশি-নব্বই দশকের ধুলোঝড় সংমিশ্রিত কোনও এক বছর হঠাৎ মেলা প্রাঙ্গণে এক প্রকাশনা সংস্থার স্টলে দেখা গেল বিপুল জনতার ভীড়। বহু উৎসুক মানুষ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সুন্দরীর স্খলিতবেশ মর্মরমূর্তি (মাটিরও হতে পারে)। সেই প্রদর্শিত বন্দিনীরই তীব্র উত্তেজক জীবনকাহিনীভিত্তিক বই-ই নাকি বিকোচ্ছে— মুড়ি মুড়কির মতো। এরই পাশাপাশি তখনকার জলাশয়টিকে ঘিরে ফরাসী কায়দায় শিল্পীদের গ্রাম 'মর্মার্ত' তৈরি হোত। একে ঘিরে সদ্য-যৌবনঅর্জিত তরুণ-তরুণীরা অকাতরে কলতান তৈরি করতেন। এখনকার মতো 'টকটাইম' শেষ বা ব্যালান্স নেই এর দৈন্য ছিল না। অনেক সময় পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে বসে অনর্গল আলাপচারিতায় কেটে যেত বইময় সন্ধ্যাগুলি।

গত তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংগৃহীত আরও বহু বই-এর সঙ্গে বইমেলায় কেনা বইগুলিকে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করি। তাদের অনেকেই দীর্ঘদিন পাঠকের স্পর্শসুখ বঞ্চিত। ইতিমধ্যেই হয়ত অনেকের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সংক্রামিত হচ্ছে। মানুষের সুখ দুঃখের এমন নিষ্কাম, বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভবনাহীন এক সময়ে অতি মমতায় লব্ধ সঙ্গীদের পরিচ্ছন্ন করি। কীটাক্রমণের আশঙ্কা রহিত করতে ওষধিও প্রয়োগ করতে হয়। জীবনের অঙ্গ পাঠাভ্যাস অনেক সময়ই আমাদের মুক্তির সোপান, তাই অবহেলা হয়ত বই-এর অন্তিম প্রাপ্য নয়। মনে পড়ে ওয়াশিংটন আরভিং-এর সেই পাঠকহীন গ্রন্থগার সংক্রান্ত হাহাকার ''অত্যন্ত ধার্মিক প্রথায় মমিদের মতো সমাধিস্থ হয়ে আছে সারাজীবনের যত্নে রচিত লেখকদের ভাবনার ফসলগুলি, হায়! মলিন হয়ে দ্রুত বিস্মৃতির ধুলোয় মিশে যাওয়াই যাদের করুণ ভবিতব্য''। (The library where authors like mummies are piously entombed & left to blacken & molder in dusty oblivion)

বইমেলা এমন সব অনুষঙ্গই টেনে আনে।

কলকাতায় আঞ্চলিক বইমেলা

অর্ণব নাগ

'আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা'র পাশাপাশি কলকাতার আঞ্চলিক বইমেলাও অধুনা যথেষ্ট জনপ্রিয়। ইতিপূর্বে কলকাতার যাদবপুর কিংবা বেলেঘাটায় আঞ্চলিক বইমেলা আয়োজিত হলেও তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারা যায়নি। সেদিক দিয়ে উত্তর কলকাতার বনেদীয়ানার একটা ছাপ নিয়ে সুতানুটী পরিষদের উদ্যোগে গত আট বছর আগে সুতানুটী বইমেলা আয়োজনের যে সূচনা হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা এখনও অটুট। কলকাতার উপকণ্ঠে বাগুইআটিতে এবং উত্তর কলকাতার প্রান্তসীমায় উল্টোডাঙ্গার মুরারীপুকুর অঞ্চলে ইদানীং আঞ্চলিক বইমেলার আয়োজন কলকাতার সার্বিক আঞ্চলিক বইমেলা'র ধারাটিকেই যে পুষ্ট করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর এই স্রোতে গা ভাসাতে কলকাতার অন্যান্য অনেক এলাকাতেও আঞ্চলিক বইমেলা আয়োজনের শুভ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আপাতত এই প্রতিবেদনের আলোচনা বর্তমান মরসুমের সুতানুটি, উল্টোডাঙ্গা-মুরারীপুকুর ও বাগুইআটি বইমেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল।

সুতানুটী বইমেলা

আয়োজক সুতানুটী বইমেলা কমিটি। বাগবাজারের জগৎ-মুখার্জী পার্কে গত ৬-১৫ জানুয়ারি এই বইমেলা আয়োজিত হয়। বইমেলার মূল থিম ছিল জন্ম শতবর্ষে-সার্ধশতবর্ষে বিস্মৃত বাঙালি। জন্মশতবর্ষে বিস্মৃত বাঙালিদের মধ্যে রয়েছেন সঙ্গীতকার কমল দাশগুপ্ত ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং রবীন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গ ভাবে দেখা এক মানুষী, রাণী চন্দ। অন্যদিকে জন্মসার্ধশতবর্ষে বিস্মৃত বাঙালিদের মধ্যে রয়েছেন স্বনামধন্যা নটী বিনোদিনী, স্বনামধন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি এই বইমেলার থিমে একমাত্র ব্যতিক্রমী সত্ত্বা। যাঁর জন্মসার্ধশতবর্ষ মহাধূমধামে পালিত হচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে। এই বিস্মৃতপ্রায় অবিস্মরণীয় বাঙালিদের সঙ্গে বইপ্রেমীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করিয়ে দিতেই প্রতি সন্ধ্যায় সুতানুটী বইমেলা প্রাঙ্গণে একেকজনের স্মরণে আলোচনা চক্র ও প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত আসর

সুতানটি বইমেলা, ২০১২

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর কলকাতার বনেদী আবহে বইমেলায় স্বাভাবিকভাবেই যে বনেদীয়ানার পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেই কলকাতা গবেষক দেবাশিস বসু সম্পাদিত সুতানুটী অঞ্চলের বাসিন্দা উনিশ শতকের পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রায় সমসাময়িক ততোধিক বিশিষ্ট পাঁচ জীবনীকারের জীবনী সম্বলিত 'ভাষভূমি ২০১২' প্রকাশিত হয় উদ্বোধনের দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুগত বসু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য মন্ত্রী আব্দুল করিম চৌধুরী, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, স্থানীয় বিধায়িকা ডঃ শশী পাঁজা এবং কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। স্টলের সংখ্যা হাতে গোণা, পাল্লা দিয়ে কম ভীড়ও, তবে অতীতপ্রিয় এবং বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণের বিষয়ে আগ্রহী পাঠক নিশ্চিন্তে তাঁদের পছন্দের বইগুলো খুঁজে নিতে পেরেছেন বলেই মনে হয়।

উল্টোডাঙ্গা মুরারীপুকুর বইমেলা

আয়োজনে উল্টোডাঙ্গা লাইব্রেরী। একমাসেরও কম প্রস্তুতিতে গত বছরের ১৭-২৫ ডিসেম্বর অরবিন্দ সেতুর পাশে এই বইমেলা আয়োজিত হলো। এনিয়ে তৃতীয়বার, তবে গত দু'বছরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল 'লোকেশনে' (তেলেঙ্গাবাগানের গলি-গুঞ্জির ভেতর সি আই টি পার্ক থেকে বড় রাস্তার ধারে) বইমেলা আয়োজিত হলেও জৌলুস ছিল কম। আয়োজকদের যুগ্ম-সম্পাদক সমীর দত্ত জানালেন এর মূল কারণ গত দু'বছরের আর্থিক ক্ষতি। যেখানে সাবেকী ঢঙে 'কিং-সাইজ' পাবলিশার্স সহ গোটা ৭০-৭৫ বড় বড় পুস্তক প্রকাশনা সংস্থাকে এনে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতির মাসুল গুনতে হয়েছিল লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে। একসময়ে তাঁরা ভেবেছিলেন, বইমেলা এবার আদৌ আয়োজন করা সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু স্থানীয় মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ইচ্ছেয় শেষপর্যন্ত বইমেলার আয়োজন সুসম্পন্ন হলো। প্রতিবছর এলাকার সংসদ-বিধায়ক তহবিল থেকে স্থানীয় ১৫টি স্কুলকে ২০ হাজার টাকার যে অনুদান দেওয়া হোত বইমেলার তরফে, শুধুমাত্র বইমেলা থেকেই স্কুলের বই কেনার শর্তে, তা একদিকে যেমন পুস্তক বিক্রেতা অন্যদিকে তেমনই এলাকাবাসীকে উৎসাহিত করেছিল বলেই উল্টোডাঙ্গা মুরারীপুকুর বইমেলা এবারও অপ্রতিহত। এমনকী বইমেলার একমাত্র আয়োজন শুধু যে বইয়েরই জন্য, এই সাবেকী ভাবনা এবারও এখানে প্রতিফলিত। সঙ্গে উপরি পাওনা ম্যামথ চিত্রশিল্পী কর্মশালা এবং ছোটদের জন্য খেলা-ধূলো, আবৃত্তি ইত্যাদির পৃথক আয়োজন। সমীর দত্তের দাবি, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সামলে নতুন বইমেলার উদ্যোগ পরীক্ষামূলকভাবে সফল এবং নতুন সুবিধাজনক 'লোকেশনে' কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত হওয়ায় আগামীদিনে এই বইমেলা আরও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

বাগুইআটি বইমেলা

এবার দ্বিতীয় বর্ষ। গত ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি, এই বইমেলার আয়োজনে ছিল বাগুইআটি বইমেলা কমিটি। মূল থিম— স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। যদিও বইমেলায় গোটা পঁচিশ স্টলের মধ্যে আলাদা করে বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের জন্য পৃথক কোনও স্টল নজরে পড়লো না। উদ্বোধক ছিলেন আদ্যাপীঠের মুরালভাই। বইমেলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা ব্যান্ড দোহার, অনুপম, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা স্টেজ মাতিয়েছেন। প্রতিদিনই থিক থিক করেছে ভীড়। পুরোনো বইয়ের পৃথক স্টলের পাশাপাশি রাজনৈতিক মতাবলম্বী পাবলিশার্সদের স্টল ও শিশুপাঠ্যর স্টল নজরে এল। স্থানীয় অবাঙালি পুস্তক-প্রেমীদের কথা মাথায় রেখেই হিন্দী-ইংরেজি বইয়ের পৃথক স্টলও চোখে পড়েছে।

ছবি : শিবু ঘোষ

অন্য রকম

বারতা দিলে আনি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অনেক রকম বার্তা আছে তাঁর। যেমন ধরুন— 'সবার জন্য শিক্ষা' কিংবা 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান' ইত্যাদি। গত ৭ জুলাই থেকে এইসব বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছনোর দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন তিনি। আপাতত তাঁর পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ছাড়াও সিকিমের গ্রামে গ্রামেও তাঁর বার্তা পৌঁছে দেবেন তিনি। ইতিমধ্যে এ রাজ্যের অনেক প্রান্তেই সশরীরে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। বাহন সাইকেল।

নিজের বাহন (সাইকেল)-এ আপন বার্তার প্রচারে দুলাল সরকার।

এটা কোনও বড়লোকের খেয়াল নয়। দেশের অগুণতি গরীব মানুষের মতো এক অতি সামান্য মানুষের— না খেয়াল নয়, বরং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলা চলে। কারণ বই-পড়া বিদ্যে তাঁকে শেখায়নি 'সবার জন্য শিক্ষা', শিখিয়েছে নিজের জীবনের সীমাহীন দারিদ্র্য। কোনও বই পড়ে তিনি শেখেননি 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান', নিজের চোখে দেখা দ্রুত পাল্টে যাওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে এটা শিখিয়েছে।

যখন শিশু তখনই হারিয়েছিলেন একটা পা, দুর্ঘটনায়। তাই বোধহয় নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যাকুলতা তাঁকে এতটা সাহস যুগিয়েছিল। পথটা এই লেখার মতো অত সহজ ছিল না। সীমাহীন দারিদ্র্যে দশম শ্রেণীতেই 'ড্রপ আউট' হন তিনি। আর সেদিনই প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন— না আর নয়, শিক্ষার গুরুত্ব এবার সবাইকে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে অভিভাবকদের, বোঝাতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদেরও। প্রথম শ্রেণী থেকে ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আসতে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের ৮২ শতাংশ ড্রপ-আউটের সম্ভাবনা রুখতে এক পায়েই সাইকেলে প্রচার চালানোর যে অনন্য উদ্যোগ নিলেন তিনি তার ফল কতটা ফলবে তা ভবিষ্যৎই বলবে, তবে এই উদ্যোগের ছিঁটেফোটাও স্কুল-শিক্ষা দপ্তরের থাকলে ড্রপ-আউটের খতিয়ান ৮২ শতাংশে পৌঁছতো না, এটা নিশ্চিত।

ব্যতিক্রমী উদ্যোগী এই মানুষটির নাম দুলাল সরকার। বয়স মাত্র পঁচিশ। বাড়ি মালদার মালাগোলায়। তাঁর নিজের কথা এবার কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক— ''আমি স্কুলে স্কুলে যাচ্ছি, মূলত গ্রামের। প্রধান শিক্ষক মশাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি এবং তাঁদের ছাত্রদের ডেকে দিতে অনুরোধ করছি। তারপর আমি ছাত্রদের খালি একটা কথাই বলছি, স্কুলে আসার চেষ্টা করো এবং কোনও পরিস্থিতিতেই পড়াশুনো ছেড়ো না। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় তাদের বলছি যে সীমাহীন দারিদ্র্যের জন্যই আমি আমার পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারিনি। যাতে তারা আমার কষ্টটা অনুধাবন করতে পারে এবং পড়াশুনোটা অব্যাহত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তবুও পড়াশুনো চালিয়ে যাবার মতো আর্থিক সামর্থ্য যাদের নেই, তাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে পড়াশোনা চালাতে বলি। কারণ এর বেশি কিছু করার সম্ভাব্য সামর্থ্য আমার নেই। তবে আমি ছোটদের বলি, জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে পড়াশোনা চালু রাখতে।''

জ্ঞানের কথা মনে হতে পারে। তবে বিশ্বাস করুন, স্কুল শিক্ষায় ড্রপ- আউটের বীভৎসতার খতিয়ানেই আমরা সন্তুষ্ট থেকেছি, তা দূরীকরণে সত্যিই সদর্থক কোনও ভূমিকার প্রয়াস করিনি। যেটুকু জ্ঞান দিয়েছি, বাস্তবতার ছোঁয়া না থাকায় সেটা জ্ঞানপাপী-র মতোই শুনিয়েছে। কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেখানে জ্ঞানের কথা আর 'জ্ঞান দেওয়া' বোধহয় থাকে না, 'জান দেওয়া'য় রূপান্তরিত হয়। তাই সম্বলহীন দুলালবাবুর সহায় গ্রামবাসীরাই। তাঁরাই যোগাচ্ছেন খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, এমনকী কখনও-সখনও অর্থও।

ভেবে দেখুন এক পায়ে সাইকেল চালানো কতটা কষ্টকর! আর সেটা যদি পাহাড়ি পথ হয়, তবে? সত্যি করে বলুন তো, সিকিমের অনেকটা পথ কিভাবে একটা মানুষ এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে এল, তা ভাববার ক্ষমতাটুকুও কি আমরা রাখি?' তবে দুলাল সরকারের যাত্রাপথের সবটাই যে কুসুমাস্তীর্ণ এমন ভাবার কারণ নেই। তাহলে দেশটা পাল্টে যেত। তবে ছোট-খাটো সেইসব বাধা-বিঘ্ন পাত্তা দিতে আদৌ রাজি নন তিনি।

তবে এহেন 'বাইসাইকেল ট্রিপ' তাঁর এটা প্রথম নয়। গত বছরই 'গাছ লাগান-প্রাণ বাঁচান' অভিযানে রাজ্যের ১৯টি জেলাতেই ঘুরেছেন সাইকেলে। এবিষয়ে দুলালবাবুর বক্তব্য, ''গ্রীনহাউস গ্যাস এবং বিশ্ব-উষ্ণায়ণ বিষয়ে বেশি কিছু জানি না। কিন্তু গ্রামের ছেলে হওয়ার সুবাদে জানি, বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব কতটা। সবাইকে বলেছি গাছ কাটা আত্মহত্যার সামিল।''

দুলালবাবুর বারতা এখন পশ্চিমবঙ্গ আর সিকিমের গ্রামে গ্রামে রটে গিয়েছে।

শীতের সার্কাস জমজমাট তৃণমূল সাপ না ব্যাঙ ?

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিদি
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই চিঠি যখন লিখছি তখন আসি আসি করে না আসা শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে বাংলায়। শীতের সার্কাসও বেশ জমে উঠেছে। রাগ করবেন না। রাজনীতির যে খেলা চলছে তাকে সার্কাস ছাড়া কীই বা বলা যায় বলুন? সত্যিই সত্যিই তো কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে আপনাদের শরিকি সম্পর্ক যেন ট্র্যাপিজের খেলা দেখাচ্ছে। সেই সার্কাসে বেড়ালের পিছনে হাওয়া দিয়ে বাঘ বানানোর খেলা আছে, আবার সাপ কিংবা ব্যাঙের গালে চুমু খাওয়ার খেলাও আছে। আর একটা খেলা আছে। সেটা বাড়তি পাওনা। শীতের সার্কাসে যেটা দেখা যায় না। সেটা আপনার নিজস্ব খেলা। জলকুমারী জলকুমারী পা ধুয়ে দে, ওপর নিবি না তলা নিবি তা বলে দে। সেই এন ডি এ সরকার থেকে ইউ পি এ-টু সব কালে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সব ঋতুতেই এই খেলা দেখাতে আপনার প্রতিভা নজির বিহীন।

দিদিভাই, সার্কাস লিখলাম বলে রাগ করলেন নাকি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি মন থেকে লিখিনি। রাস্তা ঘাটে এটাই শুনছি। সবাই মজাও পাচ্ছে। জীবন যাপনের নানা কষ্টের মধ্যে এই নির্মল আনন্দ দেওয়ার জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। না, কোনও সমালোচনা এই চিঠির লক্ষ্য নয়। শুধু সেই মজাগুলো মনে করিয়ে দিয়ে আর একটু মজা দিতে এবং নিতে চাই।

ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকে ঘোষণার খেলা আপনি অনেক দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই খেলা এখন আর জমছে না। কেউ হাততালি দিচ্ছে না। সিরিয়াস খেলাকেও জনগণ জোকারের তামাশা মনে করছে। এখন তাই সরকারি দল সরাসরি জোকারের ভূমিকায় নেমে পড়ায় জনগণ একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে এটা সিরিয়াস বিষয় নয়, হাসানোর জন্যই সব কিছু।

সরকারের ২০০ দিন যেতেই আপনি যে কাজের ফিরিস্তি দিয়েছেন তাতে দেখা গেল আপনার ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অনেকটাই সারা হয়ে গেছে। তখনই মনে হচ্ছিল, এই রে এরপর তো সরকারের কোনও কাজই থাকবে না। তখন কী হবে? আপনি বুঝিয়ে দিলেন অকাজটাও কাজ। যেমন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গ করা। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি নামটা বদলে গেছে? ঢাক ঢোল তো বাজল, কাগজে কলমে কবে দেখবে জনগণ জানা নেই। এরমধ্যেই আর এক নাম পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সেরে ফেলতে মরিয়া আপনি। সল্টলেকের ইন্দিরা ভবনের নাম বদলে নজরুল ইসলামের নামে করতে হবে। করতেই হবে। কিন্তু কেন? নামটা বদলে গেলে কি এ রাজ্যের খাওয়া, পড়া, বেঁচে থাকার সব সমস্যা মিটে যাবে? এক মুঠো ভাতের অভাবে কৃষক যখন আত্মহত্যা করছে তখন নজরুল গবেষণার জন্য এত হৈ চৈ দেখলে নজরুল মশাইও রাগ করতেন।

কিন্তু দিদি, নজরুল মশাই তো আর জানেন না যে নাম বদলটা গবেষণার জন্য নয় ওটা জাতীয় রাজনীতির অঙ্গ। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ল্যাজে পা দেওয়ার জন্যই যে ওটা খুব দরকারি।

দিদিভাই, আপনি যতদিন এন ডি এ-র সঙ্গে ছিলেন ততদিন সব সুযোগ নিয়েছেন কিন্তু দর কষাকষিটাও চালিয়ে গেছেন। তারপর কখনও কংগ্রেসকে ধরেছেন, কখনও কংগ্রেসকে ছেড়েছেন, আবার ধরেছেন, আবার ছাড়ার ছক কষছেন সবটাই ওপরে ওঠার চাল। রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেসকে আপনার দরকার ছিল। হয়ে গেছে, এবার 'যা ভাগ'। দিদি, আপনি কি লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে তত 'একা' হওয়ার চেষ্টা করবেন? ভালো থিওরি। এবার লোকসভা ভোটে কংগ্রেস খুব সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না। সব রাস্তা খোলা রাখাই ভাল। তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারা যাবে। আপাতত আপনি জলকুমারী হয়েই থাকুন। ওপর না নীচ পরে ভাবা যাবে। তবে দিদি, উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের জন্য কংগ্রেস অপেক্ষায় আছে। মুলায়ম সিংকে পাশে পেলে আপনার ঢঙেই প্রণববাবুরা বলবেন, 'থাকতে হয় থাকো, না হলে দরজা খোলা আছে।'

কলেজে কলেজে আপনার কথায় 'বাচ্চা ছেলে'রা যা করছে দিদি তাতেও আপনার লাভ। উন্নয়ন যখন করা যাচ্ছে না, তখন রাজনীতির বাজার গরম থাকা ভাল। আগুন বা বিষ মদ তো রোজ হচ্ছে না। তখন না হয় জনগণের করের টাকা মৃত মদ্যপায়ীদের বিলিয়ে খবরে থাকা যায়। সেসব না হলে হামলা হাঙ্গামাই তো খবরে থাকার ভরসা। তাছাড়া মুখে যতই বলুন ছাত্র ব্রিগেড, যুব ব্রিগেডের কাজের সংস্থান করবেন আপনি ভালই জানেন যে সেটা মামাবাড়ির মোয়া নয়, যে চাইলেই পাওয়া যাবে। তাই এসব ক্ষমতা দখলের কাজে ব্যস্ত রাখাই ভাল তরুণ সমাজকে। খালি বুঝিয়ে দিলেই হবে যে, এসব কিছুই বদলা নয়, সবই বদল।

দিদিভাই, বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে। না থাক প্রবাদ নয় আপনার আমার প্রিয় কবির লাইনই বলি। 'বাবু যত বলে পারিষদগণে বলে তার শতগুণে।' আপনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন দেখে সবাই আরও আরও আক্রমণে মেতেছে। সেদিন গান্ধী মূর্তিকে সাক্ষী রেখে আপনার প্রধান পারিষদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন শুনলাম, 'কংগ্রেস সাপের মুখে আর ব্যাঙের মুখে চুমু খাচ্ছে।' একটা খটকা লাগল। সিপিএম সাপ আর তৃণমূল কি ব্যাঙ। নাকি উল্টোটা? যদি আপনারা সাপ হন তবে দু'টো প্রশ্ন আছে। ঢোঁরা সাপ না বিষধর? ব্যাঙ হলেও দু'টো প্রশ্ন আছে। কুয়োর ব্যাঙ, নাকি বর্ষার ঘোলা জলের?

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সনাতন হিন্দুধর্মের ধারক ও বাহক হিসেবে ভারতের যুবসমাজের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরণা স্বরূপ। ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় স্বামীজির আত্মত্যাগ ও জীবনাদর্শ বর্তমান ভারতীয় সমাজের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষে তাঁর মত ও আদর্শকে পাথেয় করে যুব সমাজ যদি আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ হয় তবে ভারতবর্ষ আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে। কারণ স্বামীজি ছিলেন সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী। তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহামানব। তিনি তুলনার অতীত। তিনি অনুভব করেছিলেন যে রাষ্ট্র সুমহান্ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সম্মান দেয় সে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও জাতির জাগরণ অবশ্যই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—'If you want to know India, study Vivekananda.' তাই ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে স্বামীজির জীবনাদর্শকে অনুসরণ করা বর্তমান যুব সমাজের কাছে অবশ্যই মহান্ কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কারণ নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্বামীজির প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হওয়া শ্রেষ্ঠ উপায়। ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মহিমাকে তিনি যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সগর্বে মহিমান্বিত করেছিলেন বর্তমান সমাজে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তা উদাহরণ হিসেবে গণ্য হওয়া প্রয়োজন। স্বামীজির রেখে যাওয়া অমূল্য পথনির্দেশ জাতির কল্যাণে নিবেদিত হলে তা হবে মঙ্গলদায়ক ঘটনা। অনেক মনীষীই তাঁকে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা বলে মনে করেন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর একটি উক্তি স্মরণ করা যায় তিনি বলেছিলেন, স্বামীজি হলেন ভারতীয় স্বাধীনতার জনক। সে কারণেই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার স্বার্থে স্বামীজিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তাই সার্ধজন্মশতবর্ষে ভারতীয় সমাজ তথা সমগ্র জাতির মঙ্গল কামনায় স্বামীজির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হোক সমগ্র ভারতবাসী। তাহলেই ভারত আবার শান্তির পতাকা নিয়ে চৈতন্যের শক্তিতে জাগ্রত হবে। কবির কথায়, 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। এই পবিত্র মাতৃভূমির ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে ভারতবাসীর আত্মত্যাগের মানসিকতা অর্জন করাই হবে জন্মসার্ধশতবর্ষে বীর সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রেষ্ঠ নিবেদন।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন না তোষণ?

সম্প্রতি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজারহাটে নিউটাউনে ৬০ বিঘা জমির উপর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৫ বিঘা জমির উপর হজ টাওয়ার তৈরির শিলান্যাস করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে আরও দুটি হজ টাওয়ার সরকার তৈরি করেছেন, একটি পার্ক সার্কাসে ও অন্যটি কৈখালিতে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি হবে ২২ তলা বাড়ি যার আনুমানিক খরচ ১২০ কোটি টাকা। হজ টাওয়ার টি হবে ১২ তলা যার আনুমানিক খরচ ৭০ কোটি টাকা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা নাম সংযুক্ত করার দাবিতে দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হলে তিনি প্রয়োজনে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন, বহু মাদ্রাসা আছে এখনও সরকারি অনুমোদন পাননি। কাগজ-পত্র ঠিক থাকলে স্বীকৃতি দেবেন। ইনসাল্লাহ, আল্লার দোয়ায়, আপনাদের আশীর্বাদে ক্ষমতায় এসেছি তাই নিজেকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত। যেখানে ১০ শতাংশ উর্দু ভাষাভাষী মানুষ বাস করেন সেখানে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এছাড়া ৬০৯টি মাদ্রাসা শিক্ষককে মাসের পয়লা বেতন দেওয়া এবং ৬৫টি কবর বাউন্ডারী ওয়ালে ঘিরে দেওয়া, ১০ লক্ষ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া, সংখ্যালঘুদের বসবাসের জন্য ৬ হাজার হাউজিং তৈরি করেছেন বলে জানিয়েছেন। আগামীদিনে এই সংখ্যা ৫০ হাজারের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে বলে ঘোষণা। এরপর সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম আয়োজিত মিলন মেলায় ৯৪ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ২০ হাজার টাকা ও মানপত্র তুলে দেওয়া। গত ২৬ ডিসেম্বরে কোচবিহারে সরকার ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী নায়েব আলির স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। গত ২২.৯.১০ তারিখে রাজারহাটের পীর সাহেব মৌলানা মাহমুদ বখ্‌ত বক্তিয়ার এন্তেকাল (মৃত্যু) হলে তার মাদ্রাসার উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে স্যার সৈয়দ আমেদ আলিগড়ে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন (আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি) যার ফলস্বরূপ দেশভাগ, ২০ লক্ষ লোক নিহত, ৫০ হাজার হিন্দু ও শিখ কুমারীর গর্ভপাত করানো, লীগ-গুণ্ডাদের ধর্ষণের ফলে ৭৫ হাজার শিশুর গোপন হত্যা (দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স, ভয়েস ফ্রম দ্য পার্টিশান অব ইন্ডিয়া—উর্বশী বুটালিয়া) সেই বিষবৃক্ষের চারা রামফ্রন্ট সরকার একটি রোপণ করেছেন মুর্শিদাবাদে। একটি ভাঙড়ে (এখানে বামফ্রন্ট সরকার ৪৫০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করেছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য)। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একটি এরকম চারা রোপণ করেছে রাজারহাটে। প্রয়োজনীয় আর একটি রোপণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার কি ফল হবে তা দেখার জন্য আমাদেরকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। দেশ ভাগ এবং দাঙ্গায় যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা সকলেই এই বিষ বৃক্ষের ফল। যথা লিয়াকৎ আলি খাঁ, সর্দার আবদুর রব নিস্তার, গজনকর আলি খাঁ, নবাব আমীর আহমেদ খাঁ, নবাব মঃ ইসমাইল খাঁ, তাজমুল হোসেন, বেগম আইজাক রসুল প্রমুখ।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

নিহতদের সঠিক হিসাব

স্বস্তিকায় প্রকাশিত (সূত্র, ৭ পৌষ ১৪১৮, পৃ: ৩০) শিবাজী গুপ্তের 'বিবেকানন্দের হিসাবের ৪০ কোটি হিন্দু কোথায় গেল?' প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন 'মহম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক রাজা দাহিরের সিন্ধু আক্রমণে (৭১২ খৃঃ) মহম্মদ কাশিম দুর্গে প্রবেশ করে ছয় হাজার যোদ্ধাকে তরবারির সাহায্যে এবং তীরবর্ষণে হত্যা করেন।' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন চাচ-নামার ইংরেজী অনুবাদক Elliot & Dowson এবং বাংলায় অনুবাদ করেছেন আরতি সেন। উভয় অনুবাদ গ্রন্থে দেখা যায় ১৬ হাজার থেকে ২৬ হাজার রাজা দাহিরের সৈন্যকে মহঃ কাশিম হত্যা করেছিলেন। ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ : H. M. Elliot & Prof. J. Dowson, History of India as told by its own Historians, Vol. 1, pp. 181, 205 & 203 এবং চাচ-নামা, বাংলায় অনুবাদিকা আরতি সেন, পৃ. ৪৬, ৭০ এবং ৭১-তে এই হত্যার তিনটি পৃথক ঘটনা আছে। মোট হত্যার সংখ্যা ১৬০০০, মতান্তরে ২৬ হাজার, শ্রীগুপ্তের মতানুযায়ী ৬০০০ নয়। শ্রীমতী সেনের অনূদিত গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান : সেতু প্রকাশনী, ২নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

—ইন্দ্রনাথ সেন, কলকাতা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জমজমাট একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ সর্বভারতীয় একলব্য ক্রীড়া মহোৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মহারাষ্ট্রের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র পুণে শহরে। মারাঠা জাত্যাভিমান, আভিজাত্য, জীবনবোধের ভরকেন্দ্র এই পুণে। পেশোয়া বাজিরাও থেকে আধুনিক ভারত সভ্যতার বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের মতো জাতীয় জীবননায়কদের লীলাভূমি পুণে শহরটি সব অর্থেই অনন্য। এহেন একটি শহরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় বনবাসী তথা জনজাতিদের জাতীয় ক্রীড়া ঘিরে যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে তা যেন সামাজিক নিয়মেই এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। ৩৫টি রাজ্যের আড়াই হাজার ক্রীড়াবিদ এবারের ক্রীড়া আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অ্যাথলেটিক্স, তিরন্দাজী, কবাডি, খো-খো, ফুটবল ও ম্যারাথনে। অতিথি দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে নেপাল। আর ফুটবল এবারেই প্রথম ক্রীড়াসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হলো। সবচেয়ে বড় দল নিয়ে এসেছিল অরুণাচল প্রদেশ। বাংলা দুটি প্রান্তে ভাগ হয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন ক্রীড়াবিদ যান পুণেতে। মহারাষ্ট্রও বেশ বড় দল নিয়ে আসরে নেমে সবচেয়ে বেশি সোনার পদক (২০) জিতে নেয়। তবে তারজন্য ভাগ্য ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার সংক্রান্ত সুবিধেও পেয়েছে। দুই বাংলা মিলিয়ে ১৮টি সোনা সহ সব মিলিয়ে ৩৫টি পদকপ্রাপ্তির নিরিখে অবশ্য মহারাষ্ট্রকে (২৪) টপকে গেছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে ছত্তিশগড়ের পারফরমেন্সেও। এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা ২৫টি পদক জিতে চমকে দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের। ঝাড়খন্ডের ছেলেমেয়েরাও নিজেদের সুনাম ধরে রাখতে পেরেছে।

মহারাষ্ট্র এডুকেশন সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় বিভিন প্রতিষ্ঠানের মাঠ, আবাস, অনুশীলন কেন্দ্র সহ অন্যান্য পরিকাঠামো ব্যবহার করা হয়েছিল। চমৎকার পরিকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষকরা। এবারের ক্রীড়া মহোৎসব পরিচালনা করতে মহারাষ্ট্রের নানা স্থান থেকে ১৮ জন বিশিষ্ট প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ ও প্রশিক্ষক এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অনেকেই মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে গর্বের অভিজ্ঞান শিবছত্রপতি খেতাব জয়ী। তবে ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সের কতিপয় ইভেন্টে পরিচালনার মান নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে গেছে। ফুটবলে ঝাড়খণ্ড যোগ্য দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হলেও বাংলার বিরুদ্ধে যাওয়া কিছু সিদ্ধান্ত পদকপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। বাংলা যথেষ্ট ভাল খেললেও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। তবে তিরন্দাজি ও ম্যারাথনে বাংলার ছেলেমেয়েরা বাকি সব রাজ্যকে একপ্রকার দাঁড় করিয়ে রেখে ঝুলি ভরে পদক তুলেছে।

ক্রীড়ামহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া আজ এই জনজাতি সমাজকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অলিম্পিকে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠেছে। ভারতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে যে ক্রীড়া উন্নয়ন ও বিকাশ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তাতে অচিরেই এর সুফল পাওয়া যাবে। দশ বছরের মধ্যেই ভারত থেকে বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ উঠে আসবে। ভারতে মেধা সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই, তা যথাযথ কাজে লাগানো দরকার। সরকার, শিল্পগোষ্ঠী ও সংবাদ মাধ্যমের উচিত কল্যাণ আশ্রমের এই প্রয়াসের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে জড়িয়ে জাতিকে ক্রীড়া দুনিয়ার মানচিত্রে উজ্জ্বল অবস্থানে নিয়ে আসা। ঠিক এভাবেই সম্প্রতি অনুষ্ঠানে এসে নিজের সচেতন ও সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন লোকসভার ডেপুটি স্পিকার কারিয়া মুন্ডা। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন মঞ্চাসীন শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতি ললিত জৈন ও রাজস্থান রয়্যালস ক্রিকেট টিমের কর্ণধার। এঁরা ছাড়াও প্রতিযোগিতা সফল করতে আর্থিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র। এই প্রতিযোগীদের থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ্‌দের চয়ন করে বিশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে আর্মি স্পোর্টস্ অ্যাকাডেমি।

সংগঠনের সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ জগদেওরাম ওঁরাও, সংগঠন মন্ত্রী গুণবন্ত সিং কোঠারি সহ ক্রীড়া সংগঠক মেজর সুরেন্দ্রনাথ মাথুর, শক্তিপদ ঠাকুর, হিম্মত সিংরাও ও এই রাজ্যের দুই ক্রীড়া প্রমুখ প্রবোধ নন্দ ও আশীষ দাস আয়োজক পুণের সংগঠকদের ভূয়সী প্রশংসা করে মিটের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করেন। বছর বছর যেভাবে প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে অবিলম্বে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বিশেষ মাপকাঠির ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনটা হয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহোৎসবে। ব্লকস্তর থেকে জাতীয়স্তরে জনজাতি ক্রীড়াবিদদের নিয়ে ফি-বছর তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আর চারবছর অন্তর ক্রীড়া মহোৎসব। কল্যাণ আশ্রমের এই প্রকল্পকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করছে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া। তার সঙ্গে অ্যাথলেটিক্স, তিরন্দাজি, কবাডি ও খো-খোর জাতীয় ফেডারেশনও স্বীকৃতি ও সাহায্য দিয়ে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে।

বিদ্যার দেবী সরস্বতী

নবকুমার ভট্টাচার্য

সরস্বতী বৈদিক দেবী। উষার পরেই তাঁর স্থান। 'সরস্' শব্দের অর্থ জ্যোতি। তাই সরস্বতী অর্থে জ্যোতির্ময়ী। প্রথমে ইনি নিরাকার তথা জ্যোতিস্বরূপ ছিলেন। 'সরস্বৎ' শব্দের আরও একটি অর্থ হলো প্রচুর জলবিশিষ্ট নদী। বৈদিক যুগে সরস্বতী নামে বড় একটি নদী ছিল। সেই নদীর তীরে ঋষিরা যাগযজ্ঞ করতেন। সরস্বতীকে ঘিরেই বৈদিক যুগের কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার বিস্তার ঘটেছিল। বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে— 'অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে সরস্বতী'। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও সরস্বতী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ থেকে দু'রকমের সরস্বতীর ধারণা প্রাপ্ত হয়। প্রথমত, সরস্বতী ত্রিলোকব্যাপিনী সূর্যাগ্নির দ্যুতি এবং দ্বিতীয়ত, সরস্বতী নদী। পুরাণে বা পুরাণোত্তরকালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীরূপে প্রসিদ্ধা।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বর থেকে নিঃসৃতা হয়েছিলেন এবং তাঁরই আদেশে তিনি বিষ্ণুর স্ত্রী হয়েছিলেন। সরস্বতী তাই বিষ্ণুভার্যা নামেও পরিচিতা। দেবী সরস্বতীকে আবার ব্রহ্মার মুখনিঃসৃতা দেবীরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। দেবী সরস্বতী শিবপুরাণে শিব-দুর্গার কন্যারূপে বর্ণিত। শিবকন্যা লক্ষ্মীদেবীর ইনি সহোদরা। তিনি শিবদুর্গার কন্যা নাকি বৌদ্ধমতে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর পত্নী, তিনি হংসবাহিনী না সিংহারূঢ়া সে সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে এবং থাকবেও।

দেবী সর্বশুক্লা। ইনি অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশিনী ও মালিন্যমুক্তা। তাঁর গায়ের রং সাদা, তাঁর বস্ত্র সাদা, বীণা, পুস্তক, বাহন, অলঙ্কার— সব সাদা। দেবীর আসনে শ্বেতপদ্ম। শুক্লবর্ণ হচ্ছে শুচিতার চিন্ময়ীরূপ। তাঁর সাধনায় আমরা নির্মল হই, পবিত্র হই—আত্মজ্ঞান লাভ করি। আমরা শিখি আত্মম্ভরিতা নয়, আত্মনিবেদনেই পরমপ্রাপ্তি। আমরা বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত এমনকী বিদ্যাস্থান সমূহকে বারবার প্রণাম করি।

দেবী সরস্বতী হিন্দু সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পুজোর আসনেও অধিষ্ঠিতা। দেবী সরস্বতীর জ্যোতিঃ বিভূতি ও নদী যাবতীয় নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা ওই উভয়ের সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা। নির্মল জ্ঞানের দেবতা অজ্ঞাননাশিনী ও মালিন্যমুক্তা বলে তিনি শুভ্রা।

তন্ত্র ও পুরাণে পাওয়া যায় সরস্বতীর বিভিন্ন স্বরূপ ও শক্তি। এই চৈতন্যদায়িনী দেবী কোথাও অনিরুদ্ধ সরস্বতী, কোথাও নীল সরস্বতী আবার কোথাও মহাসরস্বতী। বৌদ্ধধর্মের সাধনপথে আমরা আবার দেবীর চারটি স্বরূপের সন্ধান পাই। এগুলি হলো— মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্র সারদা ও আর্য সরস্বতী। সরস্বতী বন্দনা দিয়েই আরম্ভ হয়েছে মহাভারত— দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ।

মৎস্য পুরাণে (৬৪/১০) বীণা, কমণ্ডলু, অক্ষমালা ও পুস্তক এই চার হস্তে শোভিতা দেবীকে পঞ্চমী তিথিতে আরাধনা করতে বলা হয়েছে। কোনও কোনও পুরাণ মতে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীর পুজো চালু করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। দেবীপুরাণ মতে সরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্যা। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী সরস্বতীর অতীব প্রিয় তিথি। তাই ওই তিথিতে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীর পুজোর বৈধত্ব। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিটি শ্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত। স্বামী অভেদানন্দ পুরাণাদি ঘেঁটে দেখেছেন, এই দিনটিতে লক্ষ্মীর সঙ্গে স্কন্দের বিবাহ হয়েছিল। তাই তিথিটি শ্রীপঞ্চমী। এই দিনটিকে কেউ কেউ বসন্ত পঞ্চমীও বলে। সাধারণত 'শ্রী' বলতে লক্ষ্মীদেবীকে বোঝালেও অনেক পণ্ডিতের মত হলো সরস্বতীরও এক নাম শ্রী কারণ তিনি অজ্ঞান রূপ জড়তা কাটিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বালেন। সেজন্য শ্রীপঞ্চমীর সহজ অর্থ হলো জড়িমা জড়িত মনের মুক্তির তিথি। সরস্বতী যেহেতু বিদ্যার দেবী সেহেতু অনেক বাবা মা সরস্বতী পুজোর দিন তাঁর শিশুটিকে সরস্বতী দেবীর সামনে হাতে খড়ি দেওয়া বা বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা করেন। বিষয়টি কিন্তু শাস্ত্রসম্মত নয়। কারণ সরস্বতী পুজোর দিন লেখাপড়া শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। সংবৎসর প্রদীপ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্নলিখেত্ততঃ।' অর্থাৎ এদিন মস্যাধার অর্থাৎ দোয়াত ও লেখনীর অর্থাৎ কলমের পুজো করবে, কিন্তু লিখবে না। অন্যস্থানে শ্রীদত্তধৃত স্মৃতি বচনে বলা হয়েছে—

শ্রীপঞ্চম্যাং লিখেন্নৈব ন স্বাধ্যায়ং কদাচন।
বাণীকোপমবাপ্নোতি লিখনে পঠনেঽপি চ।'— অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীতে লিখবে না, পড়বে না। এই তিথিতে লিখলে বা পড়লে সরস্বতীর কোপভাজন হতে হয়।

সমস্যার আগেই আইনগতভাবে সতর্ক হন

অরুণা মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের উপর আইনজীবনের অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, যেমন অল্প শারীরিক অসুস্থতার কারণকে তাচ্ছিল্য করলে ভবিষ্যতে অনেক ক্ষেত্রেই এই তাচ্ছিল্যই শারীরিক অসুস্থতার যে গুরুতর কারণ হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই পারিবারিক জীবনে সামান্য সমস্যাও ভবিষ্যতে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে যদি সেই সমস্যাকে তাচ্ছিল্য করে আইনগতভাবে মানুষ সতর্ক না হন। বহু মক্কেল আমার চেম্বারে এসে আক্ষেপ করে বলেছেন যে তাঁরাও প্রথমেই সতর্ক না হয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেননি বলেই বর্তমানে এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে। যেমন কারোর মন্তব্য ‘‘প্রথমেই স্ত্রীকে ভালবেসে সম্পত্তিগত আয় ও আমার নামে লিখিত বাড়ির ঘরের কথা সবই জানিয়েছিলাম। যেহেতু সে আমার সহধর্মিণী অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী; তার মা বাবাকেও নিছক ভালমানুষই দেখেছি— অবস্থা ভাল নয় বলে আমার মায়ের গয়নার ভল্টেই তার সব গয়না রাখিয়েছিলাম যেহেতু বাড়ীতে রাখা নিরাপদ নয় বলে। এখন দেখছি আমার শাশুড়িই দূর থেকে আমার স্ত্রীকে রিমোট কন্ট্রোল করছেন এবং স্ত্রীও মারমুখী হয়ে সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দিতে বলছে ও ভল্ট থেকে তার নিজের গহনার নামে আমার মায়ের গয়নাও সরিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় আইনগত উপদেশ দিতে গিয়ে আমি জানিয়েছিলাম— ‘‘স্ত্রীকে ভালবাসা আপনার নিশ্চয়ই কর্তব্য; কিন্তু সেই ভালবাসায় আপনার নির্বুদ্ধিতা ছিল বলেই এই পরিণতি। ভালবাসার অভিনয়ে আপনার অন্তরের সব খবরই যখন আপনার স্ত্রী তার শুভাকাঙ্খী মায়ের পরামর্শে জেনে নিয়েছিল আর আপনি নির্বোধের কাজ করেছেন তখন বর্তমানে মিথ্যা অত্যাচারের কারণকে ভিত্তি করে আপনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৮ ক ধারায় জেলের কয়েদী করার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং পূর্বের আইনগত সতর্কতার বিষয়ে আপনার এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল যে স্থানীয় থানায় ডায়েরী করা স্ত্রীর মিথ্যা মিথ্যা হয়রানি ও জোরজুলুমের ভিত্তিতে। পারিবারিক সম্মান রক্ষা করতে গিয়েই তাঁর এই বিপদের কারণ ঘটেছে বলে জানালাম। এছাড়া চেম্বারে দেখেছি বহু লোক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অসৎ মানুষের চক্রে এসে, যারা তাঁদের সরলতা ও নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়েছেন। যেমন ওই অসৎ চক্র জেরক্স কপি (zerox copy) না নিয়ে অরিজিনাল কপি (original copy) দলিল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দুর্বুদ্ধিতার অভিপ্রায়ে সরিয়ে ফেলেছেন ও পরবর্তীকালে সাদা কাগজে তাঁদের জাল সইও ধরা পড়েছে। এই ধরনের ভুল কাজ বা অসতর্ক হওয়া প্রধানত মক্কেলরাই করে থাকেন। সুতরাং প্রবীণা ও অভিজ্ঞা আইনজীবী রূপে আমি এই পরামর্শটি দেব যে ‘‘সব কাজ ভাবিয়া করিও— করিয়া ভাবিও না।’’

> **বর্তমান যুগে ‘রেজিস্ট্রেশন’ বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক বলে যেন সকলেরই মনে থাকে। এই ব্যাপারে কোনও পক্ষের উদাসীনতা, আলস্য ও রেজিস্ট্রেশনে অনিচ্ছা ইত্যাদি বিপদের কারণ বলে জানবেন, কারণ পরবর্তীকালে এটি সাংঘাতিকভাবে আইনঘটিত সমস্যা রূপে দেখা দিতে পারে।**

অঙ্গনা

বর্তমান যুগে ‘রেজিস্ট্রেশন’ বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক বলে যেন সকলেরই মনে থাকে। এই ব্যাপারে কোনও পক্ষের উদাসীনতা, আলস্য ও রেজিস্ট্রেশনে অনিচ্ছা ইত্যাদি বিপদের কারণ বলে জানবেন, কারণ পরবর্তীকালে এটি সাংঘাতিকভাবে আইনঘটিত সমস্যা রূপে দেখা দিতে পারে। অনেক সময় সম্পত্তির ক্ষেত্রেও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের সম্পত্তিতে নাম মিউটেশন (Mutation) না করানোর জন্য ও সময়মতো কর (tax) না দেওয়ার জন্যও আইনঘটিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার আগেই অভিজ্ঞ, সৎ ব্যক্তির শরণাপন্ন হবেন ও বিশেষ ক্ষেত্রে আইনজীবীদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। মৃত ব্যক্তির আইনবিরুদ্ধ ওয়ারিশরাও সম্পত্তির লোভে জাল উইল বা অন্যান্য ভাবেও আইনি ওয়ারিশদের উপর দিয়ে নিজেরা অসৎভাবে সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য আগ্রহী হয়ে পদক্ষেপ নেন। এর বিরুদ্ধেও আইনগতভাবে সতর্ক থাকবেন সামান্য সংবাদ কর্ণগোচর হওয়া মাত্র। অভিজ্ঞ আইনজীবী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও এই বিষয়ে ভূমিকা আছে।

অশুভশক্তি তোষণের এক বিস্ফোরক দলিল

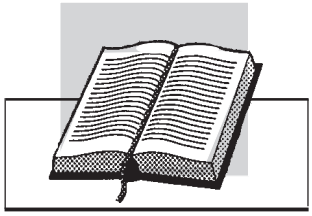

পুস্তক প্রসঙ্গ

শ্যামলেশ দাশ

শুভশক্তির ভজনাই মানবজীবনের কাম্যধর্ম। উদারতা ও সহনশীলতার মুখোশ পরে অশুভশক্তির ভজনা ও আরাধনা শুধু অবাঞ্ছনীয়ই নয়— রীতিমতো আত্মঘাতী ও সর্বনাশকারী। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামী নির্বীর্যতারই নামান্তর। এই নির্বীর্যতা একটা জাতি বা জনগোষ্ঠীকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। এটা বুঝতে আমাদের দেশের অর্বাচীন ও চরিত্রহীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বমণ্ডলী শুধু অক্ষমই নয়— অনিচ্ছুকও বটে। তারা এক সর্বনাশা নীতির ধারক ও বাহক হয়ে চলেছেন। এই সর্বনাশা মানসিকতায় ভারতের অনেক রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের ঐক্যমত আমাদের জাতীয় জীবনে এক সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে।

অম্বিকা প্রসাদ পাল 'সাম্প্রদায়িক' নামে যে বইটি লিখেছেন তা এক কঠোর পরিশ্রমের ফসল। সাম্প্রদায়িক তোষণের নজির ও উদাহরণের অনেক তথ্য ও সংবাদকে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ ও সংকলন করে লেখক ১৮৪ পৃষ্ঠার যে বইটি আমাদের সামনে হাজির করেছেন তা একটি 'হ্যান্ডবুক' বা 'রেডিরেকনার' বললে বেশি বলা হবে না। এই আত্মঘাতী নীতি ও মানসিকতা সম্পর্কে দেশ ও জাতির সতর্ক হবার সময় এসেছে। বইটি বহু বিস্ফোরক তথ্যে পরিপূর্ণ হয়ে সকলের প্রতি এক 'চেতাবনী'র (warning) কাজ করেছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক বইটি সম্পর্কে বলেছেন যে গ্রন্থকার কোনও প্রথাসিদ্ধ লেখক নন— কিন্তু একজন সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে দেখে বা সমাজব্যবস্থায় যা কিছু বিসদৃশ দেখেছেন সেই বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকেই তিনি এখানে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কোনও পাকিস্তানের চরকে বা নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত কোনও ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিককে বরখাস্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের কাজে স্বয়ং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার এক ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত লেখক এক বাংলা দৈনিকের রিপোর্ট থেকে তাঁর বইতে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন (পৃ: ১৬)। এমন বহু খবর সংবাদপত্রের পাতায় বা অন্যত্র প্রকাশিত নানা বিবরণ থেকে মানুষ জানতে পারবেন। কিন্তু ঘটনাগুলি আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। বইটির লেখক এমন বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ যা সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তাকে সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ করে সাধারণ মানুষের

যে কি উপকার করেছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। এইসব ঘটনা গ্রন্থবদ্ধ করে লেখক এক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : ''এই হলো আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্র ও দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির সঙ্গে এত বড় ভণ্ডামি তথা বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করার এক জঘন্য নজির সৃষ্টি করলেন নরসিমা রাও, এস বি চৌহান, মুলায়ম সিং যাদব, জাফর শরীফ এবং রাজেশ পাইলট।'' (পৃ: ১৬)। ভারতবর্ষের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ দেখতে গিয়ে, প্রকৃত দেশসেবা করতে গিয়ে বহু সৎ ও দক্ষ প্রশাসককে অর্বাচীন ও চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতারা মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদান করেন। অন্যদিকে আই এস আই-এর চরেরা বেকসুর খালাস পেয়ে যান। এমন ঘটনায় নজির ভারতবর্ষে অনেক আছে। বাবরি কাঠামো ধ্বংসের নিন্দায় সারাদেশ জুড়ে ধিক্কার মিছিল ও সম্প্রীতির জন্য শান্তি মিছিলের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময় পাকিস্তান বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবী জুড়ে যে কয়েক হাজার হিন্দুমন্দির ধ্বংস হলো সে সম্পর্কে কেউ কোনও উচ্চবাচ্যও করলেন না। দেশের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আইন প্রণয়নে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নির্লজ্জভাবে তোষণ করার যে জঘন্য নজির আমাদের দেশে রয়েছে তা দৃষ্টান্তসহ জনসাধারণের সামনে হাজির করা প্রয়োজন। অভিন্ন দেওয়ানী আইন আজও ভারতবর্ষে চালু করা গেল না। অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির পদলেহনে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজনৈতিক দল এক অশোভনীয় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কোনও সরকারি সতর্কতা নেই। গ্রামাঞ্চলে এই সমস্ত অশুভ শক্তির দাপটের বিরুদ্ধে নিরীহ নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়ার কোনও আইনি ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের লোভে অনেক অনাচার দেখেও মৌনীবাবা সেজে বসে থাকেন। এই তোষণনীতির কুফল আজ ভারতের বাইরেও সারাবিশ্বে ছড়াতে সুরু করেছে। তার চরম মূল্য আজ দিতে হচ্ছে আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশকেও। ইউরোপের বহুরাষ্ট্র আজ মুসলমান আতঙ্কবাদীদের দাপটে থরহরি কম্পমান। তবু তাদের চোখ খুলছে না। লেখক সকলকে সতর্ক করেছেন। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

সাম্প্রদায়িক : অম্বিকা প্রসাদ পাল
প্রকাশক : লেখক নিজে,
প্রাপ্তিস্থান : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পরিচিত বুক স্টল
মূল্য : ৮০ টাকা

বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের চিন্তনগত সাদৃশ্য অতি গভীর

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

'স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শ্রী অরবিন্দ' এক উত্তরাধিকার সন্ধান' নামেই গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। প্রকৃতই ৫২ পৃষ্ঠার স্বল্পায়তন গ্রন্থে যশস্বী লেখক ডঃ কৌশিক ভট্টাচার্য অতি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দের মধ্যে সুন্দর যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন। লেখক দুই চিন্তানায়কের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। দুজনের জন্ম কলকাতায়, দু'জনেই দক্ষিণ ভারতে পদচিহ্ন রেখেছেন। দু'জনেই কর্মবীর, আবার দুজনেই অধ্যাত্মবাদী— এবং পরম যোগী। দু'জনেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নন্দিত ও বন্দিত।

লেখক স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দের জীবনের প্রধান দিকগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করে দেখিয়েছেন কি বলিষ্ঠ এই দু'জনের জীবন জিজ্ঞাসা— দু'জনেই যোগসাধনার কথা বলেছেন অথচ কঠিন কঠোর বাস্তব, সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট ও পরাধীনতার গ্লানি এঁদের দীর্ণ করেছে।

লেখক শেষ পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রী অরবিন্দের সশ্রদ্ধ মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। শ্রী অরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন : ''পুণ্যাত্মাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।'' শ্রী অরবিন্দের বিবেকানন্দ মূল্যায়ন যেমন গভীর তেমনি দ্যুতিমান। ১৮৯৩ সালের চিকাগো বক্তৃতা, অরবিন্দের মতে, জাতির কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এই ভাষণে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা

করেছেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? বিবেকানন্দের মতে সর্বধর্মসমন্বয় বিশ্বকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান।

''রবীন্দ্রচেতনায় ভারতবর্ষ এবং প্রাসঙ্গিক স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী অরবিন্দ'' পুস্তিকাটি লেখক ডঃ কৌশিক ভট্টাচার্যের আরেকটি রচনা। ৫৩ পৃষ্ঠার স্বল্পায়তন গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবুক, তা সত্ত্বেও তিনি বাস্তববাদী; যার জন্যে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে বৃটিশ সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

লেখক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের কী সুন্দর মনন ও চিন্তনগত সাদৃশ্য। এবং সেজন্য বিশ্বকবি অকৃপণ ভাষায় এই তিন জনকে নানা সময়ে নানা ভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মোটকথা, ডঃ কৌশিক ভট্টাচার্য রচিত দুটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ যেন দুটি হীরক খণ্ড— ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল ও মনোহারী। আমরা এই দুটি গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। লেখকের কাছে আবেদন যেন আরও গ্রন্থ রচনা করে ম্রিয়মাণ আত্মবিস্মৃত জাতিকে সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

- **স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শ্রী অরবিন্দ : এক উত্তরাধিকার সন্ধান।**
  ডঃ কৌশিক ভট্টাচার্য। মূল্য : ৫৫ টাকা।
- **রবীন্দ্র চেতনায় ভারতবর্ষ এবং প্রাসঙ্গিক স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী অরবিন্দ।**
  ডঃ কৌশিক ভট্টাচার্য। মূল্য : ৫৫ টাকা।

জীবনের নানান টানাপোড়েনের কিছু ছবি

রমাপ্রসাদ দত্ত

সরকারি চাকরির দায়দায়িত্ব কমবেশি থাকলেও সেই কাজের পাশাপাশি লেখালিখির শখ বজায় রেখেছিলেন উত্থানপদ বিজলী। পূর্ব রেলপথের কর্মী হিসেবে কয়েক দশক কাটিয়েছেন। চাকরির সূত্রে কলকাতায় আসা যাওয়া। সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে নিজেকে যুক্ত করেছেন। আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। একের পর এক বিভিন্ন ধরনের লেখা তৈরি করেছেন। ছাপা হয়েছে কাগজে। কাগজের দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। লেখার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত হওয়ার দরুন দায়িত্ব বেড়েছে। অন্যরকম আকর্ষণে লেখালেখির জগতের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। আর পাঁচজন রেলকর্মীর সঙ্গে সেখানেই তফাত উত্থানপদ-র। পেশাগত সূত্রে যেখানে যুক্ত ছিলেন সেখানে পূর্ণ নিষ্ঠায় কাজ করার পর যথানিয়মে অবসর নিয়েছেন। সরকারি কাজ তাঁকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়েছে। নিজের জীবনে সাফল্য এসেছে। অনেক স্বপ্ন সাধ পূর্ণ হয়েছে। অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম তাঁর। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া এগিয়ে যাওয়া। তাঁর শ্রম এবং সংকল্প বৃথা যায়নি। লেখালেখির নেশা তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করায় অবসর সময়কে মনের মতো করে সাজাতে পেরেছেন। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর অনেকের ভাবনা থাকে সময় কীভাবে কাটবে। উত্থানপদকে তা নিয়ে ভাবতে হয়নি। তিনি অবসর যাপনের চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেছেন লেখার কাজে। সৃজনকর্ম তাঁকে ক্লান্ত করেনি। নিজের লেখার প্রতি তাঁর মমতা যথেষ্ট। সবকিছু গুছিয়ে রাখার অভ্যেস বরাবর থাকায় কয়েক দশক ধরে লেখার পূর্ণ খতিয়ান চোখের সামনে থাকে। সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে অনেকের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটেছেন। আসলে সবই হয়ে উঠেছে তাঁর ভালোলাগা এবং ভালোবাসার কাজ।

বেশ বড় মাপের বইটিতে উত্থানপদ বিজলীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর পারিবারিক পরিচয় এবং ছবির পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন সাহিত্য সভায় অংশ নেওয়ার ছবি। তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন অনেকে, যাঁরা তাঁকে বিভিন্ন সূত্রে চিনতেন। এ ধরনের বইয়ে একটু বেশি প্রশংসার বাক্য থাকেই। ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খামতির দিকগুলো ধরা পড়ে না। তা যাই-ই হোক, তার মধ্যে ব্যক্তি মানুষটির পরিচয় অনেকটাই মিলে যায়। তাঁর নিজের লেখার মধ্যে জীবনের নানান টানাপোড়েনের কিছু ছবি পাই। সেটাই বইয়ের সব থেকে বড় আকর্ষণ। এত বছর ধরে সাহিত্যপ্রেম বজায় রেখে যিনি এগিয়ে চলেছেন তাঁকে নিয়ে একটা বই যত্ন করে বেরিয়েছে— এটা ভালো খবর। আমরা বলতে পারি, সত্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলুন কলম আঁকড়ে ধরে। কারণ সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। তা বজায় রাখা দরকার সব অবস্থার মধ্যে।

উত্থানপদ বিজলী ব্যক্তি ও সাহিত্য।
অতিথি-সম্পাদক : সনৎ কুমার নস্কর।
দক্ষিণবঙ্গ শিশু সাহিত্য পরিষদ,
স্টেশন রোড (পশ্চিম)
বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪। দাম : ২০০ টাকা।

লাঠিবাজি ছেড়ে গলাবাজিতে মজেই বাঙালী মরেছে

শিবাজী গুপ্ত

২৪ পরগণা (উঃ এবং দঃ) এবং নদীয়া হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে দেশভাগের সময় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরে পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) একের পর এক হিন্দু- বিরোধী দাঙ্গায় এবং মুসলমান সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে অনুষ্ঠিত মুসলমান সমাজের গুণ্ডামিতে অতিষ্ঠ হয়ে লাখে লাখে হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রধানত এই জেলা দুটিতে বসতি স্থাপন করে বা পুনর্বাসিত হয়। ফলে হিন্দুদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। কিন্তু ক্রমাগত 'মুসলিম অনুপ্রবেশ ও হাম পাঁচ হামারা পঁচিশ' পদ্ধতি অনুসরণ করে মুসলমানদের সংখ্যা খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। আর বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের আগমনে ভাঁটা ও 'হাম্ দো হামারা এক' নীতি অনুসরণ করে হিন্দুর সংখ্যা ফুটো কলসীর জলের মতো ক্রমাগত কমতে কমতে মা-বোনের স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত রক্ষার মানসিকতাও হারিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত গান্ধী-মাহাত্ম্য প্রচার ও পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর ধরে সিপিএমের জাতীয় সংহতি মুসলিমপ্রীতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারের গুঁতায় হিন্দু যুবশক্তির আত্মশক্তি, স্বধর্মনিষ্ঠা, স্বজাতিপ্রেম— সব গাঙের জলে বিসর্জন দিয়ে একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। পৌরুষত্ব বলে কোনো পদার্থ হিন্দু যুবকশ্রেণীর কথাবার্তায় কাজেকর্মে পরিলক্ষিত হয় না।

মাঝে মাঝে প্রায়ই খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় দেহে শ্বেতি রোগের দাগের মতো হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার মাঝেও যে সমস্ত মুসলমান বসতি গড়ে উঠেছে, তার পাশের হিন্দু পাড়ায় গণ-ডাকাতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, হিন্দু মেয়েরা অপহৃত বা ধর্ষিত হচ্ছে, লুঠপাট তো হামেশা লেগেই আছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদের কথা বাদ দিই হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরের মতো হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিতেও মুসলমান এলাকার নিকটবর্তী হিন্দু এলাকার লোকদের ধনপ্রাণ, মান-ইজ্জতের কোনও নিরাপত্তা নেই। দলবদ্ধভাবে মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুপাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে যথেচ্ছ অত্যাচার করে বুক ফুলিয়ে চলে যায়। হিন্দু মেয়ে মহিলারা চোখের জলে ভাসে, পুরুষেরা ছোরা তরোয়ালের ঘায়ের জায়গায় মলম লাগাতে বসে। থানায় এজাহার নেওয়া, পঞ্চায়েত শান্তি কমিটি বসায়,— তার সদস্য হয় একদা সিপিএম বর্তমানে তৃণমূলী মুসলমান গুণ্ডার সর্দাররা। পুলিশ আসে, র‍্যাফ নামে— তারা দু'দিন প্রমোদ ভ্রমণ করে চলে যায়। তাদের লাঠি চলে না, গুলি ছোটে না। হিন্দুর শত্রু হিন্দু কংগ্রেসী, তৃণমূলী ও সিপিএম নেতারা ফুরফুরে পাঞ্জাবী পরে শান্তি মিছিল করে। সে মিছিলে মুসলমান গুণ্ডারাই সারি দিয়ে নেতাদের পেছন পেছন হাঁটে।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই গুণ্ডাদের জাত ও ধর্ম তুলে কেউ একটি কথা বলে না। মহাজন বাক্য আউড়ে বলে, গুণ্ডাদের জাত নেই। শতকরা ৯০ জন গুণ্ডা যদি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয় এবং দলমত নির্বিশেষে মুসলমান নেতারা যদি তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়— তা হলে গুণ্ডাদের জাত নেই বলা মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি ছাড়া আর কি বলা যায়?

উপরে লিখিত হিন্দু-প্রধান জেলাগুলির মধ্যে নদীয়া ও ২৪ পরগণাকে ধরা হয়নি। তার কারণ আছে। সে কারণ হলো পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের বেশির ভাগ এই দুই জেলায় বসতি গড়েছে--- বিশেষত সীমান্তবর্তী এলাকায়। এসব এলাকা থেকে অনেক মুসলমান পাকিস্তানে চলে যায় এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বিপুল সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। তার মধ্যে বিরাট সংখ্যক হলো বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর ও যশোহর থেকে আগত নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত হিন্দু। পাকিস্তান হবার আগে এই নমঃশূদ্রদের লাঠির ভয়ে মুসলমানরা থরহরি কাঁপত। কারণ নমঃশূদ্রদের গায়ে এক ঘা পড়লে তারা দশ ঘা বসাত। একদা যোদ্ধার জাত এই নমঃশূদ্রদের সাহস ও সঙ্ঘশক্তি ছিল অসাধারণ। ফলে মুসলমানরা এদের ঘাঁটাতে সাহস করত না।

নদীয়ার গোপজাতীয় ঘোষরা ছিল শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত বলে যেমন গর্বিত তেমনি বলদীপ্ত। তাদের সঙ্গে কেউ ধ্যাষ্টামি করতে গেলে দধি-দুগ্ধ ভাণ্ড বইবার বাঁকের পিটুনিতে মাথা দুই ফাঁক করে ছাড়ত। কিন্তু ইদানীংকালে এই দুই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায়ই ডাকাতি রাহাজানি মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও অপহরণ আখছার ঘটছে। সংবাদপত্রে সেসব ঘটনার যে সামান্য বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে নির্যাতিত পরিবার বা মেয়েদের কৌলিক উপাধি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্বাস, মণ্ডল, হালদার, মিস্ত্রী, হাওলাদার, সিকদার, বৈদ্য, সমাদ্দার, মল্লিক, ঢালী, অধিকারী, বল ইত্যাদি। উপাধি দেখেই অনুমান করা যায় যে এরা বেশিরভাগ নমঃশূদ্র শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এদের পুরনো সে তেজবীর্য আর নেই। তাই মুসলমান গুণ্ডারা এদের উপর, এদের মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে পার পেয়ে যায়। এদের হাতে লাঠি থাকে না, লাঠি বন্ বন্ করে গুণ্ডাদের মাথা ফাটায় না। অথচ একদিন এদের লাঠির কাছে ইংরেজের বন্দুকও হার মেনেছিল। বাঙালীর হাতের সে লাঠির গুণকীর্তন এবং তার অধঃপতনে আক্ষেপ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :—

''দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম 'বরকন্দাজ'। অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বর্‌কন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ।

হায় লাঠি! তোমার সেদিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল-খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ— হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রুপর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল,

ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে— তুমি পীনাল কোডের মতো দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মতো শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মতো রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্‌দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে। পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে— সমাজ-শাসনভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশদণ্ডমাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়া তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি না কি উত্তম ঔষধ ছিলে— মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই। 'মূর্খস্য লাঠৌষধি।" (দেবী চৌধুরাণী) সেই হিন্দুর ঘরে এখন লাঠি তো দূরের কথা, বিড়াল মারার কাঠি নেই, মাছ কাটার বঁটি নেই, আর অন্যদিকে প্রত্যেকটি পরিবার এক একটি অস্ত্রশালা— লাঠি, ছোরা, তরোয়াল, বোমা, পিস্তল, বন্দুক তাদের সব ঘরেই রয়েছে। আর নামাজের জমায়েতের মতো যে কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অস্ত্র হাতে হাজারে হাজারে জড়ো হতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগে না। হাঁক দিলেই কাজকর্ম ছেড়ে বুড়ী ছুঁড়ি মাগী মর্দ আল্লাহ আকবর বলে আল্লাকে ডাকা ধ্বনিকে হল্লার ধ্বনিতে পরিণত করে কুকর্ম ও ইতরামিতে রত হয়। নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে কলুষিত করে। অবশ্য তারা মনে করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যে কোনও অপকর্মই কোরান অনুমোদিত এবং ইসলাম ধর্ম স্বীকৃত। সুতরাং সাত খুন মাপ। এটা অবশ্য তারা মিথ্যা কথা বলে না। কোরানের পাতা উল্টোলেই তাদের যুক্তির সমর্থন মেলে।

শেষ কথা— গান্ধীর অহিংসা, নেহরুর সেকুলারিজম আর কমিউনিস্টদের কম্যুনাল হারমোনি— এই ত্রিদোষে হিন্দু সমাজ আক্রান্ত। মানবদেহে ত্রিদোষের আধিক্য ঘটলে অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ— কুপিত হলে সে রোগীর যেমন জীবন সংশয় হয়— হিন্দু সমাজও ত্রিদোষে ভুগছে, তারও শেষের দিন সন্নিকট।

সিকিমে ভূমিকম্পের জন্য সংঘের সেবাকাজ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে পূর্ব-সিকিম জেলাতে নান্দোক, গ্যাংটক, তাদোহ, দলপচাঁদ, চন্দনি, কিংস্টোন এবং উত্তর সিকিমে জংগু, লিংর্জা, ইয়েথাং, নাগা, মঙ্গন, টুং প্রভৃতি গ্রামে অনেক পরিবারে মোট ২৬ প্রকারের ত্রাণসামগ্রীর এক একটি প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এইসব সামগ্রীর মধ্যে পলিথিন, কম্বল, ক্যাম্পখাট, ঔষধ, চাল, ডাল, তোষক, মোমবাতি, গামবুট, পাইপ জ্যাক, সাবল, ছেনি, হাতুড়ী, নারকেল দড়ি, জলের জার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সার্ভে ও কোনও না কোনও সহায়তায় প্রত্যক্ষ ও সরকারের সাহায্যার্থে সমতল থেকে ৪৩ জন ও পাহাড় থেকে ৩৮ জন স্বয়ংসেবক কাজ করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির নামে নগদ অর্থ ও সামগ্রী এসে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা সেবা ট্রাস্ট সিকিম' এই নামে একটি পঞ্জিকৃত ট্রাস্টের মাধ্যমে সেবা ও সংস্কারের জন্য একটি ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণের পথে।

সমাবেশ সমাচার

সংস্কৃত বনভোজন

গত ৮ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণার (সুন্দরবন জেলার) বারুইপুরের শাসন গ্রামে আদি গঙ্গার তীরে সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে বনভোজন হয়ে গেল। সারাদিনের এই বনভোজনে ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। বিতর্ক, চর্চা সবই সংস্কৃতে। সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দেন সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সোনারপুর মহকুমা সঙ্ঘচালক পৃথ্বীশ পত্রনবীশ সংস্কৃতে বক্তব্য রাখেন। তিনি চলতি বাংলার ছড়ার সংস্কৃত অনুবাদ করে পরিবেশকে মনোরম করে তোলেন। সুন্দরবন জেলার সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালি বলেন, বাংলায় এ ধরনের উদ্যোগ প্রথম। সংস্কৃত ভারতীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ৪০ জন যুবক অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সিরহাটে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

গত ২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাওড়া জেলার মুন্সিরহাটে দশ দিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির হয়ে গেল। দুটি শিবির মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৫ জন।

এই সংস্কৃত শিবিরের সমারোপ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত ভারতীর সম্পাদক প্রণব নন্দ, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সনৎ ঘোষ এবং স্থানীয় এক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মুরারীমোহন নন্দীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমারোপ অনুষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংস্কৃত ভাষায়। সুরাবউদ্দিন নামে এক ছাত্রের মতে— ''প্রশিক্ষণ শিবিরটা আরও কিছুদিন চললে ভালো হোত। সংস্কৃত ভাষাকে আমরা আরও বেশি পরিমাণে জানতে চাই।''

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গঙ্গাসাগর মেলা সেবা শিবির

গত ১০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম কলকাতা শাখার উদ্যোগে গঙ্গাসাগরগামী তীর্থযাত্রীদের জন্য সেবা শিবির-এর উদ্‌ঘাটন করেন বনোয়ারীলাল সোতী। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেশের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষায় অমূল্য অবদানের উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি মনোহরলাল আগরওয়াল ও নন্দলাল লোহিয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি চম্পালাল সরাওগী। এছাড়া আলমবাজার মঠের সারদাত্মানন্দজী (মধুমহারাজ) শেষে আশীর্বচন প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মকর সংক্রান্তিতে সাগরমেলার তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের পথে কলকাতা ও গঙ্গাসাগরে কয়েক হাজার যাত্রীর সাতদিন যাবৎ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসছে। আউটরাম ঘাটের কাছে অস্থায়ী শিবিরে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সারা ভারত থেকে এসেছেন সাগরে পুণ্যস্নানে। তাঁদের সেবা করে ধন্য কলকাতাবাসী। কত প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংস্থা ও সমাজের নামে শিবির খুলেছেন, ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও শিবির খুলে সেবা করছেন, ভক্তি মিলিয়েছে সবাইকে। তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিবিরে সহজধারী থেকে কেশধারী, সাধু-গৃহস্থ সবাই একত্রিত। এক লঘু ভারত উঠে এসেছে— সেই দৃশ্যই দেখা গেল। প্রাকৃতিক দুর্যোগও হার মেনেছে পুণ্যার্থীদের কাছে।

মালদায় জাতীয় সঙ্গীতের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০১১ 'সংস্কার ভারতী'-এর মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে পালিত হলো ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথিরূপে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ রামেশ্বর পাল, ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, সংস্থার সভাপতি তথা প্রবীণ তবলা বাদক ও শিক্ষক গজেন দাস এবং সংগঠক সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত) চন্দন সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে সঙ্গীতা দে-র পূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত (চার সূচক) পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তাপস চক্রবর্তী।

বহরমপুরে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১১ ব্রহ্মপুর (বহরমপুর) শহরস্থিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়, ভারতমাতা সেবা মন্দিরে পরিষদের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বল্প মূল্যে চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সহায়তায় কলকাতা এম. পি. বিড়লা আই ক্লিনিক। এই শিবিরে প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি চক্ষু পরীক্ষা করান। প্রতি বছরই ব্রহ্মপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই ধরনের আই ক্যাম্প সফল ভাবে পরিচালনা করে আসছে।

সিকিমে প্রথম শীতকালীন সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

সিকিম থেকে ফিরে রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক॥ পাহাড়ী রাজ্য সিকিমে কয়েকমাস পূর্বেই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ভীতির সঞ্চার হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও আর্তদের তৎকাল সহায়তার জন্য সাংগঠনিক ভাবে ও সরকারকে সহায়তা করবার জন্য সঙ্ঘ সাধ্যমতো ত্রাণকাজে সেই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ত্রাণকাজ বর্তমানেও অব্যাহত। এইরকম এক পরিস্থিতিতে সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চলের সংঘের কার্যকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ডিসেম্বরের ঘোর শীতের সময় তাঁরা মূলত পাহাড়ের স্বয়ংসেবক এবং আশেপাশের জেলাগুলি থেকে স্বল্প সংখ্যায় হলেও স্বয়ংসেবকদের নিয়ে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হিসাবে ২০ দিনের প্রথম বর্ষ সংঘ শিক্ষাবর্গ আয়োজন করবেন।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো ত্রাণ ও নানান কারণে ব্যস্ত থাকায় এবং প্রয়াসের কিছু ঘাটতি থাকায় লক্ষমাত্রার চেয়ে বর্গে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কিছু কম হলেও উৎসাহ-উদ্দীপনা, পরিবেশ, ব্যবস্থা ইত্যাদিতে কোনও অভাব ছিল না। গত ২৫ ডিসেম্বর বিকালে শুরু হয়ে ১৫ জানুয়ারি ২০১২ সকালে দীক্ষান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে এই বর্গ শেষ হয়। মোট ৯টি জেলার ১৮ স্থান থেকে ২৩ জন শিক্ষার্থী, ৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন প্রবন্ধক বর্গে সবসময় ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ জন কর্মচারী, ৬ জন কলেজ ছাত্র ও ১৬ জন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। উত্তর-পূর্ব সিকিমের একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র পাকিং থেকে ৫ কিমি দূরে অত্যন্ত মনোরম স্থান পাঁচেখানি শিবালয় মন্দির পরিসরে বর্গের আয়োজন হয়। অন্য সময় ওই পরিসরে প্রায় ৫০ জন ছাত্র বেদ অধ্যয়নের জন্য আবাসিক হিসাবে থাকেন। বর্গের বর্গাধিকারী ছিলেন সিকিম বিভাগ কার্যবাহ তারানিধি নেপাল, বর্গকার্যবাহ উত্তরপূর্ব সিকিম জেলা সহ-কার্যবাহ নারদ ভট্টরাই এবং মুখ্যশিক্ষক রামদয়াল বর্মন। সর্বব্যবস্থা প্রমুখ সিকিম বিভাগ প্রচারক বাদল দাস।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয়, ক্ষেত্রীয়, প্রান্তীয় স্তরের অনেক অধিকারী বৌদ্ধিক, চর্চা, বৈঠক ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য বর্গ পরিদর্শন করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অখিল ভারতীয় সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ মহাবীরজী, শ্রীকৃষ্ণজী, সুনীলপদ গোস্বামী, অজিতভাই সহ আরও অনেক কার্যকর্তাবৃন্দ। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে বর্গে উপস্থিত ছিলেন রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক। ১৪ জানুয়ারি প্রকাশ্য সমারোপে বক্তব্য রাখেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত। ভোর পৌনে পাঁচটা থেকে শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত বিবিধ কার্যক্রমে ঠাসা। অধিকাংশ চর্চা, বৌদ্ধিক কথাবার্তা নেপালি ভাষাতেই হয়েছে। স্থানীয় বিভিন্ন পরিবারের মা-বোন ও অভিভাবকেরা উৎসাহের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন বর্গ দেখতে আসেন। সার্বিকভাবে এক উৎসাহ উদ্দীপনা সবসময় বজায় ছিল।

শব্দরূপ-৬১১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

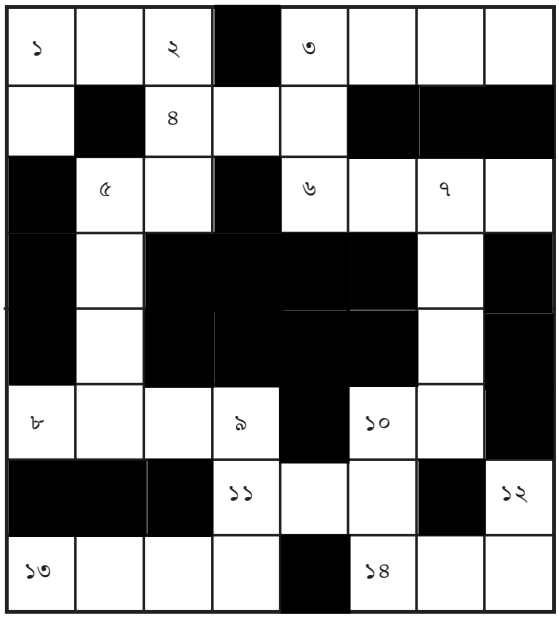

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বৃত্রসংহারে বৃত্রাসুরপত্নী, **৩.** অখণ্ড ব্রহ্মা, অবতার দেবতা বা সগুণ ঈশ্বর নয়, **৪.** সুন্দর, কান্ত, চারু, কোমল, **৫.** ''এতটুকু—, করেছিনু আশা'' **৬.** বন্ধন করিবার পৌরাণিক অস্ত্র; বরুণের অস্ত্র **৮.** আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বকৃত্য) **১০.** অনন্তর, **১১.** ব্যঞ্জনা, প্রকাশ, **১৩.** ইন্দ্রের হস্তী, **১৪.** সূর্য।

উপর-নীচ : ১. ''—, বাক্য, মাণিক্য'' একতা অভিন্নতা, **২.** লোলুপতা, লোভ, **৩.** কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত দানবী বিশেষ, **৫.** বাঘজাল; ছক কাটিয়া তাতে ঘুঁটির খেলা বিশেষ, **৭.** জৈনতীর্থংকর, **৯.** জোনাকি, **১০.** আদিহীন, উৎপত্তিহীন, স্বয়ম্ভূ, **১২.** বিষ্ণু।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০৯
সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
৯এ, অভেদানন্দ রোড
কলকাতা-৬

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ম	ঘ	বা	■	উ	প	গু	প্ত
নু	■	গি	রি	জা	■	■	■
■	চা	চা	■	ন	ষ্ট	চ	ন্দ্র
■	ন্দ্রা	■	■	■	■	গু	■
■	য়	■	■	■	■	শো	■
গ	ণ	প	তি	■	ব	ক	■
■	■	■	মি	না	র	■	মে
যু	গ	ন্ধ	র	■	দা	মি	নী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬১১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ৮

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)